উনিশ-বিশ শতকে শৈশব নির্মাণে বাংলা রূপকথা-উপকথা (নির্বাচিত)

এম. ফিল. (বাংলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক: **সন্দীপ নস্কর**

রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা: 118835 of 2012-13

ক্রমিক সংখ্যা: 001700103004

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা: MPBE194004

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক: **অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া**

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

CERTIFICATE

This is to certify that the following pages contain original research on 'উনিশ-বিশ শতকে শৈশব নির্মাণে রূপকথা-উপকথা (নির্বাচিত)' by Sandip Naskar (Examination Roll No: MPBE194004; Registration No: 118835 of 2012-13) to be submitted in order to fulfil the partial requirement for the award of the degree of Master of Philosophy in Bengali at Jadavpur University, Kolkata. The research has been done under my supervision and I recommend it for examination.

I further certify that the following is original work and no part of it has been submitted anywhere else for any other Degree or Diploma.

Supervisor

Head of the Department

Department of Bengali

প্রস্তাবনা

পৃথিবীতে যা কিছু পুরাতন আছে, পুরাতনের যে তথাকথিত সংজ্ঞা, যার উপর ভিত্তি করে আমরা পুরাতনকে ‘পুরাতন’ বলি সেই পুরাতন ধারণার সাথে আমরা একটা মাত্র বিষয়কে মেলাতে পারি না। পৃথিবীতে একটাই মাত্র বস্তু আছে যা কখনো পুরাতন হয় না। কোনোকালেই পুরাতন না হওয়া এই বস্তুটি হল ‘শিশু’। শিশুর এই যে প্রতিমুহূর্তে নতুনত্ব, তা নিয়ে বলতে গেলে বলা যায়, শিশুর মতো পুরোনো আর কিছু নেই। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে শিক্ষা, প্রথা, রীতিনীতি অনুসারে বয়সে বড়োদের অনেক নতুন নতুন পরিবর্তন হয়ে চলেছে কিন্তু শিশু হাজার বছর আগে ঠিক যেমনটা ছিল, আজও ঠিক সেরকমই আছে।

শিশুর ধারণা আসলে যে কখনোই পুরাতন হয় না, শিশুর এই নতুনত্ব কিভাবে থাকতে পারে, সর্বোপরি শিশুর ধারণা নিয়ে ভাবনা মাথায় আসার পর এটা মাথায় আসে শিশুর ‘শৈশব নির্মাণ’। শিশুর ধারণা যতই পুরাতন না হওয়া ধারণা হোক না কেন শিশুকে ছোটো থেকে বড় করার চিন্তা সব বাবা-মায়ের থাকে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যদি শিশুর ছোটো থেকে বড় হবার journey-টা দেখি তাহলে দেখতে পাবো সেই শিশুকে নিয়ে কি বিস্তর আয়োজন। প্রতিটি বাবা-মা চায় নিজের মতো করে তার শিশুকে মানুষ করতে। এই মানুষ করার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। প্রচুর প্রচুর নিয়মের বেড়াজালে আটকে শিশুকে মানুষ করাটাই প্রতিটি বাবা-মায়ের একমাত্র চাওয়া। এই চাওয়া আসলে বর্তমান সময়ের তৈরি নয়। শিশুকে বা শিশুর শৈশবকে নির্মাণ করার এই ধারণা উনিশ শতকের। কিভাবে শৈশব নামক ধারণা তৈরি হচ্ছে, কি কি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শৈশব ধারণার জন্ম হচ্ছে, শৈশব ধারণার সঙ্গে কোনো

গুরুতর রাজনৈতিক অভিসন্ধি যুক্ত কিনা, হঠাৎ করে শৈশব নিয়ে আলোচনা কেনই বা শুরু হল এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়ার আগ্রহ আমাকে বেশি করে উৎসাহিত করেছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে শিশুর শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো নতুন নতুন ধারণা যুক্ত হয়েছে। উনিশ শতকের সেই ধারণার সঙ্গে বর্তমান সময়ের নতুন নতুন ধারণাকে নিয়েই আসলে বর্তমানের শৈশব নির্মাণ। আমরা আমাদের গবেষণার পরিসরে বর্তমান সময়ের শৈশব নির্মাণের ধারণা নিয়ে কথা বলতে চাইনি। আমরা কথা বলতে চেয়েছি উনিশ-বিশ শতকের শৈশব নির্মাণ নিয়ে। শৈশব নির্মাণে রূপকথা-উপকথার ভূমিকা কি, তা বলাই আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। দুই শতাব্দীর তিনটি রূপকথা-উপকথার বই নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা শিশুর শৈশব নির্মাণের প্রক্রিয়াকে বোঝার চেষ্টা করছি।

শৈশব নির্মাণ এবং শৈশব নির্মাণ প্রক্রিয়ায় রূপকথা-উপকথার ভূমিকা নিয়ে যে ভাবনা, সেই ভাবনার কথা যখন আমার শিক্ষিকা, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়াকে জানাই, তারপর থেকে তিনি আমাকে উৎসাহপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নানা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণার কাজ করা সম্ভব ছিল না। উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবর্গ বাঙালি যেমন ‘বই’কে তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেছিল তেমনভাবেই আমিও এই সামান্য গবেষণার কাজটিকে আমার শিক্ষিকাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখিয়েছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়টি নিয়ে নানা পরিসরে ভাবতে সাহায্য করেছে সৌম্য দা। তাকে ধন্যবাদ জানানোর ধৃষ্টতা আমার নেই। এছাড়াও নানাভাবে সাহায্য করেছে বন্ধু প্রীতম সেন, অর্পণ নস্কর, অর্ণব দাস। সাহায্য করেছে ভ্রাতৃপ্রতিম তাপস দাস, দেবরাজ দেবনাথ, মোহন গায়েন, শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তর্পণ সরকার।

এছাড়াও সাহায্য করেছে তনুজা গাজী, পর্ণাশা সরকার। শেষমুহূর্তে গোটা কাজটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে বিশেষ সহযোগিতা করেছে কস্তুরী গুপ্ত। দুটি ব্যক্তির কথা একটু আলাদা করে বলা প্রয়োজন, যাদের কথা না বললে কাজটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তারা হল অভীক ঘোষ এবং গীতশ্রী সরকার। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এঁদের সকলকে ছোটো করার অধিকার আমার নেই, এঁদের প্রতি রইল অনেক ভালোবাসা। ভালোবাসা জানাই কুন্তলা সরকারকে। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় এবং বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মী ও কর্তৃপক্ষকে। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার বাবা এবং মাকে, তাঁদের শুভেচ্ছা ছাড়া এই কাজ অসমাপ্ত থাকত।

মে,২০১৯

সন্দীপ নস্কর

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

ভূমিকা ৭

প্রথম অধ্যায়:

ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার ও বাঙালির শৈশব ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়:

শৈশব নির্মাণ প্রকল্পনায় রূপকথা-উপকথার ভূমিকা ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়:

রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলির সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিচার ৬৯

চতুর্থ অধ্যায়:

রূপকথা-উপকথা এবং বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণ: নির্বাচিত সংকলনগুলির তুলনামূলক আলোচনা ১১৯

শেষকথা ১৫১

গ্রন্থপঞ্জি ১৫৫

ওয়েবসাইটপঞ্জি ১৫৭

ভূমিকা

ছোটোবেলায় রূপকথার গল্প পড়েনি কিংবা শোনেনি এমন সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। ছোটোবেলায় আপনমনে পড়তে পড়তে যে সমস্ত বই অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে অজান্তেই, প্রাথমিকভাবে শেখার শুরু যে সমস্ত বই থেকে, রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলি তার মধ্যে অন্যতম। ছোটোবেলায় অজান্তেই প্রিয় হয়ে ওঠা এই বইগুলির প্রতিও আছে আমাদের প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা। এই অবজ্ঞার কারণ কি? রূপকথা-উপকথার প্রতি এই অবজ্ঞার কারণ হিসাবে যে যে কারণের কথা বলা হয় তা হল এই সংকলনের গল্পগুলির কাহিনী আজগুবি, অলৌকিক। বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন এরকম অভিযোগও আমরা করে থাকি। এই গল্পগুলি যাদের জন্য লেখা তাদেরকে ভয় দেখানো আমাদের কাজ নয়। কিন্তু দেখা যাবে এই সংকলনের গল্পগুলির মধ্য দিয়ে শিশুর মনে ভয়ের জায়গা তৈরি করে দেওয়া হয়। এরকম অনেক অভিযোগ আমরা রূপকথা-উপকথার গল্পগুলির সম্বন্ধে করে থাকি। কিন্তু এই অভিযোগের ভিত্তি কতটা? আসলে রূপকথা-উপকথার গল্পগুলি সম্বন্ধে অভিযোগ করে থাকেন যারা, খেয়াল করলে দেখা যাবে তারা কেউ 'শিশু' নয়। প্রত্যেকটি মানুষের বড় হয়ে ওঠার প্রাক্‌শর্ত হিসাবে যে সময়কালটির অনিবার্য উপস্থিতি আছে অর্থাৎ 'শৈশব' নামক এই সময়কালকে পার করে আসা ব্যক্তিরাই এই অভিযোগ করে থাকেন। আসলে রূপকথা-উপকথার গল্পগুলিকে দেখতে হবে সমস্ত যুক্তিতর্ককে অতিক্রম করে। দেখতে হবে শিশুর মতো করে। রূপকথা-উপকথার গল্পগুলি শিশুর মনোজগতে কি প্রভাব বিস্তার করে সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। শিশুমনের উপর রূপকথা-উপকথার অনিবার্য প্রভাব বোঝাতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

"পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্বদা মশগুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্তবিস্তৃত,

বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্যে, যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।"[১]

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি পরিবারে সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয় হল 'শিশু'। নিজের শিশুকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে না, এরকম বাবা-মা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর। একটি শিশুর জন্ম হওয়ার পর থেকে শুরু করে বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে ভাবিত হয় বাবা-মা। শিশুকে ছোটো থেকে জোর করে বড় করে তোলার প্রচেষ্টাই একমাত্র প্রচেষ্টা বলে মনে করে এখন বাবা-মা। বর্তমান সময়ে একটি শিশুকে ছোটো থেকে বড় করার প্রক্রিয়া আসলে সমাজ থেকে সেই শিশুকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার শুরু বাবা-মায়ের হাত ধরে। বর্তমান সময়ে বাচ্চাকে ছোটো থেকে শেখানো হয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা, প্রযুক্তির ব্যবহার। বই হাতে দেবার থেকে মোবাইল ফোন হাতে দিয়েই বেশি শান্তি পান অধিকাংশ শিশুর বাবা-মা। খেলাধূলা, শরীরচর্চার কথা না বলাই ভাল। আসলে প্রতিমুহূর্তে শিশুকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটা চেষ্টা অধিকাংশ বাবা-মা সচেতন, অচেতনভাবে করে থাকেন।

শিশুকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এই চেষ্টা শুরু হয়েছে উনিশ শতকের সূচনা থেকে। উনিশ শতকের আগে আমাদের দেশে যে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেখানে শিশু বা শৈশব ধারণার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। শিশুর পরিবর্তে 'ছোটো' ধারণার খোঁজ পাওয়া যায়। পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কালকে 'ছোটো' বলে গন্য করা হত। উনিশ শতকেই এই 'ছোটো'র ধারণা শিশু বা শৈশবে রূপান্তরিত। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার এই পর্বে শিশু বা শৈশব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টির উল্লেখযোগ্য অবদান আছে তা হল 'শিক্ষা'। আসলে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষা

মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বাঙালিকে শৈশব নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শে শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণি তার ভাবীকালকে এই শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। আমরা আমাদের কাজের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির শৈশব নির্মাণ করার প্রক্রিয়াকে। একইসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করেছি উনিশ-বিশ শতকের এই শৈশব নির্মাণ প্রক্রিয়ায় রূপকথা-উপকথার ভূমিকাকে।

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারপর্বে শিশু বা শৈশব একরকমের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা বয়সে ছোটোরা করে না। এই আকাঙ্ক্ষা একান্তভাবেই বড়োদের। সামাজিক নিয়মের যুক্তিগুলি শিশুর কাছে বোধগম্য নয় বলে এবং সামাজিক নিয়মের যুক্তিগুলি শিশুর উপর ন্যস্ত নয় বলে শিশুর কাছে শিশুত্বের উপলব্ধি স্বাভাবিক। বড়োরা এই স্বাভাবিকতা বোধ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে তাদের এরকম আকাঙ্ক্ষা করতে হয়। উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালির শৈশব নির্মাণের এই আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য ছিল।

উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শিক্ষার যে প্রকল্প সেই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ‘শিশু’। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিশুর ‘শৈশব’ নির্মাণের যে প্রয়োজনীয় উপযোগবাদী চাহিদা, সেই চাহিদা পূরণের জন্য বিধিবদ্ধ যে পড়াশুনার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেই ব্যবস্থায় রূপকথা-উপকথার ভূমিকা কি তা আমাদের আলোচনার বিষয়। আমাদের এই কাজের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার ও বাঙালির শৈশব। ঔপনিবেশিক শিক্ষা চালু হবার পর নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত বাঙালি তার শৈশবকে কি পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে চেয়েছে তা আমরা আমাদের প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরি হওয়া এবং তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একটা গোটা জাতির অনুপস্থিত শৈশব কিভাবে ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠল এবং উনিশ শতকের পূর্ব সময় পর্যন্ত ‘শিশু’ সম্বন্ধে তেমন বিশেষ আগ্রহ না থাকা সত্তেও কিভাবে উনিশ শতকের

প্রাক্‌লগ্ন থেকে শৈশব চর্চা এত নিবিড়ভাবে জায়গা করে নিয়েছে তা বলার চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

আমাদের সবার এটা জানাবোঝার মধ্যে আছে 'নির্মাণ' অর্থে তৈরি করা। কোনো কিছুকে তৈরি করাকে আমরা সাধারণ অর্থে 'নির্মাণ' বলতে পারি। আমরা জানি প্রত্যেকটি শিশুর ছোটো থেকে বড় হয়ে ওঠা মুখ্যত স্বতঃস্ফূর্ত। এখানে নির্মাণের কোনো অবকাশ থাকে না। আমরা যদি নির্মাণের অস্তিত্বকে মানতে চাই তাহলে শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ততায় বাহ্য উপস্থিতির হস্তক্ষেপকে স্বীকার করতে হয়। 'নির্মাণ' অর্থে শিশুর নানামাত্রিক চলনকে বাহ্য উপস্থিতির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট, পরিচিত ঘেরাটোপের মধ্যে বাঁধার চেষ্টা করা হয়েছে কিনা এবং সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শিক্ষার সূচনাপর্বে গড়ে ওঠা যে বিশাল প্রাইমার সেই প্রাইমারের মাধ্যমে 'গোপাল' এবং 'রাখাল'এর একটি বাইনারি অবস্থান তৈরি করে তথাকথিত স্বতঃস্ফূর্ত শৈশবকে বিধিবদ্ধ 'গোপাল'এ পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে কিনা এবং এই প্রক্রিয়ায় রূপকথা-উপকথা কি ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা আমরা আমাদের এই গোটা প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি শৈশব নির্মাণ প্রকল্পনায় রূপকথা-উপকথার ভূমিকাকে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা যখন পাকাপাকিভাবে এদেশে তার জায়গা করে নিয়েছে তখন শিশুশিক্ষা বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শিশুর শিক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে 'প্রাইমার'। এই প্রাইমারগুলির মাধ্যমে সার্বিকভাবে শৈশব নির্মাণ সম্পূর্ণ হচ্ছে কিনা, না হবার কারণেই কি রূপকথা-উপকথার প্রয়োজন হচ্ছে তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে প্রথমে কোন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রূপকথা-উপকথাগুলি সংগ্রহ করা হচ্ছে তা বলা হয়েছে একইসঙ্গে শৈশব নির্মাণে রূপকথা-উপকথার ভূমিকাকে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাইমারগুলির পাশাপাশি রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলি শিশুর চেতনার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে কিনা তাই এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়।

ভাষা হল এমন এক মাধ্যম বা অস্ত্র যা সমাজের উপরিতলে অবস্থান করে রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শৈশবের নির্মাণেও তাই ভাষার ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কাজের ক্ষেত্রে নির্বাচিত যে সংকলনগুলি সেই সংকলনগুলির ভাষা শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করে তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে নির্বাচিত সংকলনগুলির গল্পগুলি, গল্পগুলির ভাষা, বিভিন্ন ধরণের চরিত্র, তাদের মুখের ভাষা ব্যবহার, চরিত্রদের কথা বলার ধরণ শিশুমনের আগ্রহকে বজায় রেখেও কিভাবে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নির্মাণ করতে চেয়েছে শৈশবকে তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণ হচ্ছে কিভাবে। আমরা আমাদের কাজের ক্ষেত্রে যে তিনটি রূপকথা-উপকথার সংকলনকে নিয়েছি সেই তিনটি সংকলনের তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মিত হচ্ছে কিভাবে। বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণ হচ্ছে কিভাবে তা বলতে গিয়ে আমরা প্রথমেই বলার চেষ্টা করেছি নির্বাচিত সংকলনগুলির গড়ে ওঠার ইতিহাস। কোন পরিস্থিতিতে বইগুলি লেখা হচ্ছে এবং বইগুলির মধ্য দিয়ে শৈশব নির্মাণের প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্পন্ন হচ্ছে তা বলার চেষ্টা আছে। নির্বাচিত যে সংকলনগুলি সেগুলি রচনার মধ্যবর্তী সময়ের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণে কোনো প্রভাব ফেলছে কিনা, সর্বোপরি এই সংকলনগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি কিভাবে তৈরি হচ্ছে তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

শৈশব নির্মাণের এই যে পুরো প্রকল্প, এই প্রকল্পে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভূমিকা, রূপকথা-উপকথার ভূমিকা, ভাষার ভূমিকা এবং সর্বোপরি নির্বাচিত সংকলনগুলির ভূমিকা পর্যায়ক্রমে বলার মধ্য দিয়ে শৈশব নির্মাণ সার্বিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা বলার চেষ্টা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

উল্লেখপঞ্জি

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘রূপকথা’, *একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন,* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), ১৯৯২, পৃ. ৪৫

প্রথম অধ্যায়

ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার ও বাঙালির শৈশব

‘ঔপনিবেশিক শিক্ষা’ অর্থাৎ যে শিক্ষা কোনো দেশের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা নয়। উপনিবেশ গঠনের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা তাই আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষা। ঔপনিবেশিক শিক্ষা হোক বা দেশীয় শিক্ষা, সব ক্ষেত্রেই ‘শিক্ষা’ কথাটি আছে। তাই শিক্ষা কি, শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তা আমরা সংক্ষেপে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। যে কোনো কিছু বিষয় নিজের মধ্যে আয়ত্ত করার জন্য প্রতিমুহূর্তে যে অভ্যাস বা চর্চা তাই ‘শিক্ষা’। ইংরেজি ‘Education’ কথাটির আভিধানিক অর্থও একইরকম, শিশুকে যোগ্যভাবে গড়ে তোলা এবং শিশুর মধ্যেকার বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলা। আসলে ‘শিক্ষা’ কথাটির মধ্যে যেমন ব্যাপকতা আছে তেমনই শিক্ষা কথাটিকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেও ধরা যায়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার ধারণা বা অস্তিত্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগে আঁচ করা যায়। শিশু বংশ পরম্পরায় বাবা-মার থেকে যে বৃত্তিগত শিক্ষা অর্জন করত তাও ব্যাপক অর্থে শিক্ষার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে বসবাস করার ফলে শিশুর মধ্যে যে সামাজিক বোধ বা সমাজ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় তা আসলে বৃহৎ অর্থে শিক্ষার মধ্যে পড়ে। শিক্ষা কথাটিকে যদি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে চাই তাহলে বলা যায় শিক্ষা, যা আসলে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

এটা আমাদের সবার জানাবোঝার মধ্যে আছে যে উনিশ শতকে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে আমাদের দেশে একটা দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। ক্রমে সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে এক নতুন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা শুরু করার আগে আমাদের দেশের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

দেশীয় শিক্ষা বা বলা যায় দেশজ শিক্ষা কথাটির অর্থ দেশের শিক্ষা বা দেশ থেকে জাত শিক্ষা। কোনো দেশের মাটিতে যে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে তাই দেশজ শিক্ষা, অর্থাৎ

যে শিক্ষা বাইরে থেকে চাপানো নয়। কোনো একটি বিশেষ দেশের বসবাসকারী মানুষজন যখন নিজেরা নিজেদের জন্য একটা নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং যা তারা নিজেদের মতো পরিচালনা করে তাকেই সেই দেশের দেশজ বা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলে। উইলিয়াম অ্যাডাম ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে, উনিশ শতকের গোড়ায় বাংলা ও বিহারে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল সে সম্পর্কে তিনটি প্রতিবেদন সরকারে পেশ করেন। এ সংবাদ আমাদের জানাচ্ছেন শ্রী পরমেশ আচার্য মহাশয়। এই প্রতিবেদনে দেশজ শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি (উইলিয়াম অ্যাডাম) বলেন –

"যেসব স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যেগুলি দেশীয় লোকের সাহায্যে দেশীয় লোকের দ্বারা স্থাপিত অর্থাৎ যেগুলি কোনো ধর্মীয় সংস্থা বা দাতব্য সংস্থার সাহায্যে গড়ে ওঠেনি, সেইসব স্কুলকে প্রাথমিক স্কুল বলা হচ্ছে।"[১]

ভারতের শিক্ষা কমিশন দেশজ শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। সে সংবাদ দিচ্ছেন শ্রী পরমেশ আচার্য মহাশয়। ১৮৮৩ সালের প্রতিবেদনে দেশজ শিক্ষা নিয়ে ভারতের শিক্ষা কমিশন বলেছে –

"দেশজ শিক্ষালয় বলতে বোঝায় সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলি দেশীয় লোকেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং যেগুলিতে দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইসব শিক্ষালয়গুলি হয় শুধু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান না হয় একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষালয়।"[২]

শিক্ষা কমিশনের মতে –

"প্রাথমিক শিক্ষার চাইতে উচ্চশিক্ষায় ধর্মীয় প্রভাব অনেক বেশি, সে হিন্দুর টোলই হোক বা মুসলমানের মাদ্রাসাই হোক।"[৩]

শিক্ষা কমিশন আরও জানাচ্ছে যে -

"হিন্দুর উচ্চশিক্ষালয়গুলিতে কার্যত ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের প্রবেশ নিষেধ; কিন্তু হিন্দুর প্রাথমিক পাঠশালায় সকল বর্ণের ছেলেরাই পড়তে পায়; তাছাড়া এই শিক্ষার বিষয়গুলির ব্যবহারিক উপযোগিতা এমন যে

নিচুশ্রেণির লোকেদের বিভিন্ন পেশায় পারদর্শী হতে আর লেনদেনের ঠগ-জুয়াচুরির হাত থেকে রেহাই পেতে তাদের সাহায্য করে; অন্যদিকে মুসলমানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রাধান্য দেখা যায়, সেখানে অঙ্কের চাইতে কোরানের উপর জোর দেওয়া হয় বেশি।"[৪]

ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমাদের দেশে লেখাপড়া করার দুটো একেবারেই আলাদা ধারা চালু ছিল। একটা উঁচুশ্রেণির মানুষের সংস্কৃত ও আরবি-ফারসি শিক্ষাধারা। অন্যটি গতরখাটা মানুষের কথার ভাষায় লেখা, পড়া ও অঙ্ক শেখার ধারা। এই দুটি শিক্ষাধারা ছিল পরস্পর পরস্পরের থেকে সম্পর্কহীন। এই দুই ধারার শিক্ষাকে পরিচালনা করার জন্য কোনো কেন্দ্রিয় সংগঠন ছিল না। সরকার বা রাষ্ট্র এদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তারও করত না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার অধিকার কায়েম করার জন্যই এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটায়। দ্বিতীয় কোনো ধারা নয়, একটি নির্দিষ্ট ধারায় এক এবং একমাত্র সর্বময় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে তারা। ফলে দেশীয় শিক্ষার অবনতি শুরু হয় এবং সাধারণ গতরখাটা মানুষের শিক্ষার সুযোগটুকুও সেই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়।

এটা আমাদের সবার জানাবোঝার মধ্যে আছে যে সামন্ততান্ত্রিক গ্রামসমাজের বিভিন্ন ধারার মধ্যে স্থিতাবস্তা বজায় রাখার কারণেই দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। উঁচু শ্রেণির ব্রাহ্মণদের জন্য ছিল টোল চতুষ্পাটির শিক্ষা, মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব উঁচুশ্রেণির জন্য ফরাসি শিক্ষা। একেবারেই যারা সাধারণ মানুষ, তাদের জন্য ছিল পাঠশালা শিক্ষা। সাধারণ মুসলমানের জন্য মখতব।[৫] পাঠশালা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর একটিও ছিল না। বাকি যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা বলা হল তার প্রত্যেকটির সাথে ধর্ম, শ্রেণিবিভাজন ইত্যাদি বিষয়গুলি যুক্ত ছিল। একমাত্র পাঠশালা ছিল সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যার সাথে ধর্ম, শ্রেণি ইত্যাদির যোগ ছিল না। এখানে সবাই পড়াশুনা করতে পারতো। এখানে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হত, সেই কারণেই কৃষি

সমাজের একেবারে নিচের শ্রেণি পর্যন্ত এই শিক্ষাধারা প্রসারিত ছিল। এই শিক্ষার সঙ্গে বাধ্যবাধকতার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেই কারণে আমরা দেখতে পাবো ঔপনিবেশিক শিক্ষার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েও বেশ অনেক দিন সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই পাঠশালা শিক্ষার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল এই যে এখানে কায়িক শ্রমের মর্যাদা দেওয়া হত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকালে শিক্ষার এই ভূমিকা কমতে থাকে এবং শ্রমবিমুখ গতর আয়েশি একটি বিশেষ শ্রেণি অভিমুখী শিক্ষাধারা গড়ে ওঠে। উপযোগবাদের এই ধরণের শ্রেণি অভিমুখী শিক্ষা উপনিবেশের আদর্শ শিক্ষা। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় কিভাবে উপযোগবাদের এই শ্রেণি অভিমুখী শিক্ষা এত প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করলো এবং সেই সঙ্গে একটা জাতির অনুপস্থিত 'শৈশব' নিয়ে মাতামাতি শুরু হল। বাঙালির এই শৈশব কি তাহলে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? উপযোগবাদের এই ধারণার সঙ্গে কি বাঙালি তার শৈশবকে ভিড়িয়ে দিতে চেয়েছে? এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার ও বাঙালির শৈশব।

কোম্পানি তার শাসনের প্রথম দিকে দেশীয়দের ঐতিহ্য যা কিছু আছে সে সব কিছুতে সরাসরি কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। জোর করে পাশ্চাত্য ধ্যানধারনা দেশীয়দের উপর চাপাতে চায়নি। আমরা দেখবো প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ১৭৮০ সালে 'কলকাতা মাদ্রাসা' তৈরি করছে কোম্পানি। একইসঙ্গে আরো বারো বছর পর ১৭৯২ সালে তৈরি করছে 'বেনারস সংস্কৃত কলেজ'। দুটি আলাদা ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য দুটি আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে। এখানে কোম্পানির রাজনৈতিক অভিসন্ধিটা খুব স্পষ্ট। আসলে কোম্পানি শুরুতেই দেশীয়দের শিক্ষার যে ঐতিহ্য সেটাকে অগ্রাহ্য করেনি। দেশীয়দের শিক্ষার এই ঐতিহ্যের প্রতি কোম্পানির এই আগ্রহ দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছিলেন –

"লার্ড হেস্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্বে, প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানতাকূপে পতিত থাকিলে, কোনও কালে, রাজ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না; এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লার্ড হেস্টিংস বাহাদুর, এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা, প্রজাদের মঙ্গলের নিমিত্তই, ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপিত করিয়াছেন; অতএব, সর্ব্বপ্রযত্নে, প্রজার সভ্যতা সম্পাদন ইঙ্গরেজ জাতির অবশ্যকর্ত্তব্য। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।"[৬]

১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা এবং ১৭৯২ সালে বেনারস সংস্কৃত কলেজ – এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি মূলত তার মহানুভবতার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিল। কোম্পানি যে দেশীয় শিক্ষা নিয়ে খুব ভাবিত তা এই দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথাটির মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে দেশীয়রা আসলে কোম্পানির প্রজাই। এই প্রজার জন্য যা কিছু তাই আসলে কোম্পানির কারণেই। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কোম্পানির এই নীতির সাথে সহমত পোষণ করছেন। এর পরিনাম হিসাবে পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো একই দেশের মানুষ হয়েও পরস্পর পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিস্তর ব্যবধান। দেশীয় সমাজের যে সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল সেই বিন্যাস আরও প্রকট হয়েছে।

দেশীয়দের শিক্ষার যে ঐতিহ্য তাতে হস্তক্ষেপ না করার যে মনোভাব, সেই মনোভাবের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ১৭৮৫ সালে হেস্টিংসের একটি লেখায়। তিনি সেখানে বলছেন –

"ভারতবর্ষ বিষয়ে অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ব্যবহারিক দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ... কারণ এর ফলে পারস্পরিক ব্যবধান কমে আসে; শৃঙ্খল দিয়ে এদেশীয়দের যেভাবে ব্রিটিশাধীন করা হয়েছে তার ভারও কমে যায়। ব্রিটিশদের মনেও এদেশের ভাল করার ইচ্ছা ও দায়বদ্ধতার মনোভাব তৈরি করে।"[৭]

সেই কারণে আমরা দেখতে পাবো ১৮১৩ সালের পরবর্তী সময় থেকেই কোম্পানি দেশীয় শিক্ষায় হস্তক্ষেপ শুরু করে। প্রথমদিকে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি কারণ বিদেশী শাসনকে

ভারতীয়দের দিক থেকে সমস্যাহীনভাবে গড়ে তোলাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয়দেরকে, তাদের মস্তিষ্ককে দখল করতে পারলেই বাকি কাজটি যে সমস্যাহীনভাবে হয়ে যাবে তা তারা বুঝেছিল। ফলত দেখতে পাবো কোনোরকম বিকল্প প্রতিবাদী স্বর ছাড়াই বহুদিন ধরে চলে আসা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশীয় শিক্ষাকে ধ্বংস করে ঔপনিবেশিক শিক্ষা এদেশে তার আসন পাকা করেছে। দেশীয় শিক্ষার ধারাকে ধ্বংস করে দিয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষার পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নেবার কারণ হিসাবে আমরা দেশীয় গ্রামসমাজের ভাঙন এবং সেই সঙ্গে নাগরিক সমাজের দ্রুত রূপান্তরকে দেখতে পারি।

গ্রামসমাজের ভাঙন এবং নাগরিক সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের কারণ হিসাবে আমরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকে দায়ী করতে পারি। সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ, সমাজের সামাজিক যে স্তরবিন্যাস সেটাকেই পাল্টে দিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণ হিসাবে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলা যেতে পারে। কৃষিভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতির জমিদারি বিন্যাসের পরিবর্তন বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার জন্য দায়ী। যার ফলে ঔপনিবেশিক শিক্ষা আইনসঙ্গতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তা জনসমাজ দ্বারা সমর্থন পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমির উপর জমিদারের স্থায়ী স্বত্বপ্রদানের মাধ্যমে জমিদারি থেকে কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্বকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন কর্ণওয়ালিশ। এবং সেই সঙ্গে 'সূর্যাস্ত আইন'এর প্যাঁচে পড়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারার ফলে অনেক জমিদারি লাটে ওঠে এবং সেই জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। এই সময়কালে কলকাতা শহরে নতুন গজিয়ে ওঠা যে বুর্জোয়া তৈরি হয়েছিল প্রধানত দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুৎসুদ্দিগিরি করে তারাই এই নিলামে উঠে যাওয়া জমিদারিগুলির ক্রেতা। এরাই আসলে নতুন জমিদার বলে সমাজে পরিচিত হয়। এই নতুন তৈরি হওয়া জমিদার শ্রেণির সঙ্গে গ্রামসমাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এরা

ছিল শহরের বাসিন্দা। এরাই জমিদারির নতুন মালিক। পরবর্তীতে এরাই নতুন জমিদারি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু গ্রামীণ জমিদারি ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত সেহেতু মুনাফার জন্য নতুন জমিদার শ্রেণি জমিতে আর্থিক বিনিয়োগ করবে, এটাই স্বাভাবিক বিষয়। ফলত মুনাফার জন্য জমিতে আর্থিক বিনিয়োগ ও জমিকেন্দ্রিক গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে উৎপাদন সম্পর্কের যে সামাজিক বিন্যাস, তার বদল ঘটে। এই বদল ঘটার দরুন গ্রামসমাজের ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রামীণ অর্থনীতির শ্রেণি সম্পর্কগুলি নষ্ট হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান শ্রেণি হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরাই উপনিবেশের শিক্ষার নিয়ন্ত্রক। এরা শহরে থাকত এবং গ্রামের সঙ্গে যে কোনো সম্পর্ক ছিল না তা আগেই বলা হয়েছে। যেহেতু গ্রামের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না সেহেতু শ্রেণিস্বার্থ পরিপোষক গতর-আয়েসি কায়িক শ্রমবিযুক্ত শিক্ষাদর্শ গড়ে তোলাই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। এই কারণে শিক্ষার সাথে একধরণের উপযোগবাদের সম্পর্ক চলে আসে। ব্যবহারিক শিক্ষার কারণে গড়ে ওঠা পাঠশালায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা এই উপযোগবাদের কারণে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার বিষয়গুলি নতুনভাবে গঠিত হতে থাকে। আসলে শিক্ষার বিষয়গুলি নতুনভাবে গঠিত হওয়া এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকালে দেশীয় পাঠশালাগুলি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। পূর্বে যেমন পাঠশালাগুলি সমবেত চেষ্টায় টিকে থাকত, চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কারণে পাঠশালাগুলি ব্যক্তি মালিকানার আওতায় চলে আসে সেকারণে এখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ইচ্ছার বাইরে প্রতিষ্ঠানের একটা নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। পাঠশালাগুলির একটা বিশেষ শ্রেণি অভিমুখও তৈরি হয়ে যায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে, তা হল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়গত বিভাজন। নতুন যে জমিদার শ্রেণির কথা বলা হচ্ছে তারা সবাই

ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। অভিজাত যে মুসলমান বাঙালি তারা নতুন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে চায়নি সেই কারণে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় এরা পিছিয়ে পড়ে। এছাড়াও মুসলমানদের অহংবোধ এবং প্রতিবাদী মনোভাব এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক স্বার্থে যখন কোম্পানি ফারসি ভাষাকে বাদ দিয়ে বাংলা এবং ইংরেজি ভাষাকে গুরুত্ব দেয় তখন এই হিন্দু অভিজাত শ্রেণির ফারসি সম্বন্ধে একধরনের বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়ে যায়। ফারসিকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার গুরুত্বদান হিন্দু-মুসলিম বিভাজনকে আরো স্পষ্ট করেছে। আসলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার শুরুতে যে মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ তারা মূলত হিন্দু। বাংলা ভাষাকে গুরুত্বদানের ফলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাংলা ভাষার একটা আদর্শ রূপ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলত বাংলার অন্যান্য ঔপভাষিক বৈচিত্র্যগুলি বাতিল হয়ে বাংলা ভাষার এক আদর্শ রূপ গড়ে ওঠে।

বাংলার দেশজ শিক্ষা বিষয়ে উইলিয়াম অ্যাডামের যে প্রতিবেদন সেই প্রতিবেদনে জানানো হচ্ছে বাংলা ও বিহারে দেড় লক্ষ গ্রামের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি করে পাঠশালা ছিল। এই পাঠশালাগুলি ছিল সবার জন্য সঙ্গে এগুলি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। সামাজিক উৎপাদনের সাথে এই পাঠশালার সম্পর্ক ছিল।[৮] সেই কারণে দেখা যায় ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিস্তারের সূচনার পরেও এই ধরণের পঞ্চাশ হাজার পাঠশালাকে ১৮৮১-৮২ সালের মধ্যে শিক্ষাবিভাগের মধ্যে আনা হচ্ছে।[৯] এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালাগুলির সংস্কারও শুরু হচ্ছে। এই সংস্কারের অভিমুখ ছিল স্বাভাবিকভাবেই সদ্য গজিয়ে ওঠা শহুরে মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণি নির্ভর। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি অভিমুখ তৈরি হয়ে যাওয়ার কারণে এই পাঠশালাগুলির যে আদর্শভিত্তিক শিক্ষাধারা ছিল তা ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এছাড়াও গ্রামের যারা অভিজাত শ্রেণি ছিল তারা শহরে চলে আসার কারণে পাঠশালা চালানোর জন্য যে ব্যক্তিগত সাহায্য পাওয়া যেত, তাও কমতে শুরু করে। সংস্কারের মধ্য দিয়ে পাঠশালাগুলির রূপান্তর পুরনো পাঠশালার মডেলকে নষ্ট করে এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অ্যাডাম 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র ১৮১৮-১৯ সালের রিপোর্ট উল্লেখ করে জানাচ্ছেন যে তখন কলকাতার দুশো এগারোটি পাঠশালায় মোট চার হাজার ন'শো আট জন শিক্ষার্থী ছিল। তাঁর মতে এই সংখ্যা দেশীয় শিশুর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।[১০] ১৮১৩ সালের পর থেকে কোম্পানি দেশীয় শিক্ষায় সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সরাসরি হস্তক্ষেপের কারণে দেশীয় পাঠশালা শিক্ষা অপ্রাসঙ্গিক হতে শুরু করে। এছাড়াও দেখা যাবে এই পাঠশালাগুলির পাশাপাশি দেশীয় অভিজাত শ্রেণি এবং ইংরেজদের জন্য নামমাত্র ইংরাজি স্কুল এবং মিশনারিদের উদ্যোগে কিছু বাংলা স্কুলও গড়ে উঠছিল। সেই সঙ্গে টোল-চতুষ্পাটি, মাদ্রাসা, মখতবগুলিও চালু ছিল। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি বিনাশের কারণে যারা শহরে আসতে শুরু করেছিল তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের কারণে পাঠশালাগুলির চাহিদা বাড়ে। এই গ্রাম থেকে আসা শিক্ষিতদের কারণে কলকাতাকে ঘিরে পাঠশালা শিক্ষার প্রসার ঘটে। এবং এর সমান্তরালে উপনিবেশের ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়, এরকম ঔপনিবেশিক শিক্ষার মডেলও প্রবর্তন করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে একদিকে পাঠশালা শিক্ষাকে সংস্কারের মাধ্যমে তাকে আধুনিক করা হচ্ছে পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও তৈরি করা হচ্ছে। দুটি প্রোজেক্ট একসাথে চালানো হচ্ছে আসলে।

উনিশ শতকের সূচনা পর্বে ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত বিশেষ বিরূপ ছিল না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেবের মতো দেশীয় শিক্ষিত মানুষজন উপনিবেশের শিক্ষার আদর্শকে ঠিক বলে মনে করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে কোম্পানির যে অবাধ বাণিজ্য ও উপযোগবাদের মনোভাব ছিল তা দেশীয় এই সমস্ত শিক্ষিত লোকজন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সমর্থন করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছিলাম উপনিবেশের সূচনাপর্বে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কোম্পানি কোনো বিরূপ মানসিকতা দেখাতে চায়নি। চার্লস গ্রান্টের প্রস্তাবে ইংরেজি শিক্ষা চালুর সুপারিশ থাকলেও ১৮১৩ সালের আগে কোনোরকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

১৭৯৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণের বছরে উইলিয়াম উইলবারফোর্স শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে দুটি প্রস্তাব আনলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। উইলিয়াম উইলবারফোর্সের প্রস্তাব ছিল ইংল্যান্ড থেকে শিক্ষক আনানোর ব্যবস্থা করা হোক এবং মিশনারিদের উপর যে নিষেধাক্কা আছে তা বর্জন করা হোক। আমরা এটা জানি যে প্রথমদিকে মিশনারিদের ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে নিষেধাক্কা ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাবো ১৮১৩ সালে এসে উইলবারফোর্সের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয় অর্থাৎ মিশনারিদের উপর থেকে ধর্মচর্চা করতে না পারার যে নিষেধাক্কা ছিল তা বর্জন করা হয়। ধর্মচর্চা করতে না পারলেও নানা হিতকর কাজকর্ম মিশনারিরা করতে শুরু করেছিল। স্থানীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করার পাশাপাশি দেশীয় ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও চালাতেন মিশনারিরা। ১৮১৩ সালের পর থেকে মিশনারিদের এই ধরণের কাজকর্ম বাড়তে শুরু করে। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে দেশীয় শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় তার উদ্দেশ্য ছিল –

"ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষদের উৎসাহ দেওয়া এবং দেশীয় সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ও উন্নয়ন; দ্বিতীয়টি হল ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের উন্নতিসাধন।"[১১]

ভারতবাসীর মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং দেশীয় সাহিত্যকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এই বলা কথার সঙ্গে এই সময়কার শিক্ষিত মানুষ সহমত ছিলেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষাকে আরো মসৃণভাবে বিস্তার করার উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে কোম্পানির এই আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ করার ঘোষণা। সেই সঙ্গে কোম্পানির আমলে আর্থিকভাবে ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত লোকজনেরও ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রতি একরকমের সমর্থন তৈরি হয়ে গেছিল। আসলে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক ভাবে, আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষজনের সমর্থন ছাড়া এত সহজে দেশীয় শিক্ষাধারাকে বাতিল করে একেবারেই অচেনা একটা ভাষাকে জনমানসে বিস্তার করা যেত না।

১৮১৩ সালের এই সময়ে আমরা দেখতে পাবো মিশনারিদের ভূমিকা। সঙ্গে এও দেখতে পাবো ডেভিড হেয়ারের মতো ইউরোপীয়রা বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন করে পাঠদান শুরু করছেন। এইসব বিদ্যালয়ে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা মাধ্যমে যা শিক্ষা দেওয়া হত তা আসলে উপনিবেশের শিক্ষার আদর্শকে মান্যতা দেয়। ১৮১৩ সালের পরবর্তী সময় থেকে এই ধরণের বিদ্যালয়গুলিকে একসাথে যুক্ত করার জন্য 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) ও 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) তৈরি করা হচ্ছে। দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে সমরূপ ধাঁচে গড়ে তোলার জন্য এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই দুটি সংস্থা গড়ে তুলছে কোম্পানি। অ্যাডাম এই ধরণের পাঁচ হাজার পাঠশালার উল্লেখ করছেন যাদেরকে এই দুটি সংস্থার আওতায় আনা হচ্ছে।[১২]

এই সংস্থাগুলি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এই ধরণের পাঠশালাগুলিতে যে বাধ্যতামূলক আনুশাসন নীতি চালু করা হয় তার ফলস্বরূপ কৃষক পরিবার থেকে আসা ছেলেমেয়েরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। আসলে এই সংস্থাগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সুবিধার কারণে উপনিবেশের আদর্শ নাগরিক তৈরির যে ধারণা সেই ধারণা ছিল। একধরনের আরোপিত শৃঙ্খলাও ছিল। শিক্ষকদের বেতন যেহেতু কোম্পানি কিছুটা বহন করত সেই কারণে ছাত্রছাত্রীদের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়গুলি মান্যতা পেত না। পড়াশুনা করতে যে পরিমাণ খরচ করতে হত তা দেবার সাধ্য, ক্ষমতাও এই কৃষক পরিবারগুলির ছিল না। ফলে গ্রামের মানুষের শিক্ষা পাবার বা শিক্ষিত হবার সুযোগ শেষ হয় এবং শিক্ষায় উপার্জনশীলদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপার্জনশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি বিশ্বাস করত পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ইংরাজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা যথার্থ অর্থে আধুনিক হয়ে উঠবে। তাই দেখতে পাওয়া যাবে রামমোহন রায়ও ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে কোনো বিরুদ্ধ মত পোষণ করছেন না। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই ভূমিকা ঔপনিবেশিক শিক্ষাকে আরোপ করতে সাহায্য করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারে বাঙালি

মধ্যবিত্তের এই ভূমিকা শিক্ষার ক্ষেত্রে একধরণের শ্রেণি অভিমুখ তৈরি করে দিয়েছিল। এই শিক্ষার সাথে এই মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বার্থও জড়িত। সেই কারণে দেখা যাবে ১৮৩৫ সালে টমাস বেবিংটন মেকলে শিক্ষা বিষয়ে যে কার্যবিবরণী পেশ করছেন সেখানে দেশীয় শিক্ষাকে একেবারে নাকচ করে দিয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত করার কথা বলছেন। নতুন হুকুমনামায় বলা হয় এর পর থেকে প্রাচ্যবিদ্যার আর কোনো বই সরকারি টাকায় ছাপানো হবে না। শিক্ষাখাতে যে টাকা বরাদ্দ তার পুরোটাই খরচ করা হবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য।[১৩] দেশীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য ইংরাজি শেখাটা যে অবশ্য কর্তব্য তা বলা হচ্ছে। ক্রমে দেখা যাবে ইংরাজি ভাষা সংস্কৃত, আরবি, ফারসি কে পদানত করে ক্ষমতার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকে যে ভাষা ছিল ভাবপ্রকাশের বিকল্প একটা মাধ্যম তাই পরবর্তীতে হয়ে ওঠে একমাত্র বিকল্প।

ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত করানোর মানসিকতা তৈরি করার পাশাপাশি কোম্পানি নবনিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা, আইন-কানুন শেখানোর জন্য ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরি করছেন। একদল সুদক্ষ ইংরেজ শাসক তৈরি করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। এই শিক্ষার মূল বিষয় ও মাধ্যম হয়ে ওঠে বাংলা ভাষা। দেশীয় জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার অন্যতম মাধ্যম যে বাংলা ভাষা তা কোম্পানি বুঝেছিল। কিন্তু ঔপভাষিক বৈচিত্র্যের কারণে এই ভাষাতে সুদক্ষ হতে পারার অনেক সমস্যা ছিল। তাই ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেবার পরিকল্পনা দেখতে পাবো আমরা। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব ছিল উইলিয়াম কেরীর হাতে। তিনি চেয়েছিলেন বিকল্প হিসাবে ভাষার এমন একটি রূপ গড়ে তুলতে যা কিনা ইংরাজি ভাষা অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে। ইংরাজি ভাষা অনুশাসনকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বাংলা ভাষার যে নির্দিষ্ট রূপ সেই রূপে বইরচনা শুরু হয়। প্রথমদিকে বাঙালি এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যবস্তু না হলেও বাঙালিদের মধ্যে এই বিশেষ ধরণের

মার্জিত বাংলার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা শিক্ষায় এই মার্জিত মান্য রূপ একটি অন্যতম মডেল হয়ে ওঠে। এই বিশেষরকম ভাষাই ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীর কিছু শেখার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে। কোম্পানি বুঝেছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির ইংরেজির প্রতি যতই মোহ থাকুক না কেন এক বিশেষ ধাঁচের বাংলা শেখানো জরুরি। সেই কারণে ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা শিক্ষাকে শিক্ষার আওতায় আনা হয়।

দেশীয় যে পাঠশালাগুলি সেগুলিকে সংস্কারের জন্য 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'ক্যালকাটা বুক সোসাইটি'র আওতায় আনা হয় সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শ প্রকাশ পায় এরকম স্কুলও চালু করা হচ্ছে। আসলে কোম্পানি দেশীয় পাঠশালাকে প্রথমদিকে অস্বীকার করতে পারেনি। পাঠশালাগুলিকে সংস্কার ও ঔপনিবেশিক শিক্ষার আদর্শ স্কুল - এই দুটি উদ্যোগ একসাথে চলতে থাকে। সেকারণে দেখা যাবে ১৮১৯ সালে যেখানে মাত্র পঁচিশটি পাঠশালাকে সোসাইটির তত্ত্বাবধানে আনা হচ্ছে ১৮৭২ সালে গিয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পঞ্চাশ হাজার। এই পাঠশালাগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে প্রাথমিক স্কুলে পরিণত করা হচ্ছে। এ তথ্য জানা যাচ্ছে ১৮৭২ সালের প্রথম শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে।[১৪] পরবর্তীতে দেখা যাবে এই পাঠশালাগুলিকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে বাঙালির কাছে বাংলা বা ইংরাজি স্কুলগুলিকে অনিবার্য করে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। শিক্ষিত বাঙালির মনে এই বাংলা বা ইংরাজি স্কুলগুলিকে অনিবার্য করে তোলার ক্ষেত্রে মিশনারিদের গঠন করা স্কুলগুলির সক্রিয়তাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮২৪ সালে চার্লস লাসিংটন জানাচ্ছেন, এই সময়কালে বিভিন্ন সোসাইটি তাদের আওতায় বেশ কিছু কিছু স্কুল চালাত। ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে এই স্কুলগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। লাসিংটন জানাচ্ছেন এই সময়ে চার্চ মিশনারি সোসাইটির ক্যালকাটা কমিটি প্রায় নটি স্কুল পরিচালনা করত। এইসব স্কুলে একইসঙ্গে বাংলা ও ইংরাজি

ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত। 'ক্যালকাটা চার্চ মিশনারি অ্যাসোসিয়েশন'এর সাতটি স্কুলে প্রায় একশো ত্রিশ জন পড়ুয়া ছিল। 'ক্যালকাটা ডায়োসেসান কমিটি' 'সার্কেল' প্রথায় স্কুল পরিচালনা করত। প্রতিটি সার্কেলে পাঁচটি বাংলা ও একটি ইংরাজি স্কুল থাকত। এইসব স্কুলে ছশো সাতানব্বই জন পড়ুয়ার কথা জানাচ্ছেন উইলিয়াম অ্যাডাম তার প্রতিবেদনে। 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'র ছটি স্কুলে পড়াশুনা করত একশো ষাট জন। 'লেডিস সোসাইটি' দশটি মেয়েদের স্কুল চালাত, যেখানে পড়াশুনা করত দুশো সাতাত্তর জন।[১৫] এইসব স্কুলে মেয়েদের পড়াশুনার বাইরে বাংলার মাধ্যমে ইংরাজি শেখানোর প্রচেষ্টা ছিল এবং মেয়েদেরকে পড়াশুনার বিষয়ে উৎসাহও দেওয়া হত। মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে কোম্পানির এই ভূমিকাকে দেশীয় শিক্ষাচিন্তকরাও অস্বীকার করতে পারেনি।

১৭৭৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হবার পর প্রশাসনিক প্রয়োজনে যে জীবিকার সুযোগ তৈরি হয়েছিল সেখানে ইংরাজি ভাষা জানাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল। সেই কারণে দেখা যাবে এর পরবর্তীতে ফারসি ভাষার ব্যবহার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে এবং পরিবর্ত মাধ্যম হিসাবে বাংলা ও ইংরাজির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে। এখানে এই যে বাংলা ভাষার কথা বলা হচ্ছে তা বাংলা ভাষার একটা আদর্শ রূপ। চাকরির প্রয়োজনে দেখা যাবে ইংরাজি শিক্ষার বিষয়ে দেশীয় অভিজাত শ্রেণি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। আসলে কোম্পানি ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে এই অভিজাত শ্রেণিকে নিয়ে একটা আলাদা সমাজ গঠনের চেষ্টা করে। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংবাদপত্রের সেকালের কথা'র দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৪ সালে জুলাই মাসে কলকাতার বিভিন্ন ইংরাজি স্কুলের পড়ুয়াদের একটা তথ্য দেন। এই তথ্য দেবার মাধ্যমে এটাই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে এই সময়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে বঞ্চিত করে যে সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণির জন্ম হয়েছিল তারা আসলে এই ইংরাজি শিক্ষার প্রতি কতটা আগ্রহী ছিল। আসলে

এইসব স্কুলগুলির মাধ্যমে দেশীয় মধ্যশ্রেণির মানুষকে সামাজিক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। ইংরাজি স্কুল এবং পড়ুয়াদের সংখ্যা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে, হিন্দু কলেজে ছাত্র ছিল ৩৩৮ জন, স্কুল সোসাইটি অধিগৃহীত পাঠশালাতে ছাত্র ছিল ৩০০ জন, ডাফ স্কুলে ছাত্র ছিল ৩৫০ জন, হিন্দু বিনিবোলেন্ট স্কুলে ছাত্র ছিল ৯০ জন, ইউনিয়ন স্কুলে ছাত্র ছিল ১২০ জন, চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে ছাত্র ছিল ১২০ জন, জুবিলি স্কুলে ছাত্র ছিল ৭০ জন, হিন্দু ফ্রি স্কুলে ছাত্র ছিল ১৬০ জন, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ছাত্র ছিল ২০০ জন, নতুন হিন্দু স্কুলে ছাত্র ছিল ৪০ জন।[১৬] এইসব স্কুলে ছাত্রসংখ্যার এই পরিমাণ আসলে দেশীয় ছাত্রের কাছে ইংরাজির প্রাধান্যকেই প্রকাশ করে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারে আরো কিছু স্কুলের কথা বলা প্রয়োজন। এই স্কুলগুলির মাধ্যমে ছাত্ররা পরবর্তীতে ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করত। যে স্কুলগুলির কথা আমরা বলতে চাইছি তা হল ১) ইংরাজি স্কুলের আদর্শে গড়ে ওঠা বাংলা পাঠশালা। ২) অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুল। ইংরাজি স্কুলের আদর্শে গড়ে ওঠা বাংলা পাঠশালাগুলিতে দেশীয় শিক্ষকরাই পড়াতেন। যে বইগুলি ব্যবহার করা হত তা স্কুল বুক সোসাইটির ছাপা। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ইংরাজি স্কুলকেই অনুসরণ করা হত। এখানে বাংলা শেখানোর পাশাপাশি ইংরাজি শেখানো হত। আরপুলি, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাগুলি এই মডেলের আদর্শ উদাহরণ।[১৭] অন্যদিকে অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলের মাধ্যমে বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরাজিও শেখানো হত। ১৮৩৫ সালে মেকলের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হওয়ার পর বাংলাকে অস্বীকার করে ইংরাজিকে এই স্কুলগুলির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। পুরোপুরিভাবে সে চেষ্টা সফল না হলেও বাংলা ও ইংরাজি দুটি ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা এই স্কুলগুলির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। আসলে এই সময়কালে গড়ে ওঠা শিক্ষার সব মাধ্যমগুলিতেই ইংরাজিকে অবশ্যিক ভাষা হিসাবে জায়গা দেওয়া হয়। দেখা যাবে কোম্পানির মাধ্যমে যে

স্কুলগুলি গড়ে ওঠে সেখানে ইংরাজিকে প্রধান জায়গা দেওয়া হচ্ছে একইসঙ্গে এই ইংরাজি শিক্ষার আদর্শে গড়ে ওঠা অন্যান্য যে পাঠশালা বা বিদ্যালয়গুলি সেখানেও ইংরাজিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাতে নারীশিক্ষাকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উনিশ শতকের এই সময়কালে নারীদের শিক্ষা বিষয়ে স্কুল তৈরি করা হচ্ছে। আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা তাদের সন্তানকে ভবিষ্যতের নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শকে গ্রহণ করুক। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথমদিকে নারীশিক্ষা নিয়ে খুব বেশি ভাবনাচিন্তা না করা হলেও পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শের কারণে নারীশিক্ষা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এবং তারপরেই দেখা যায় নারীশিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন। ১৮১৮ সালে রবার্ট মে'র উদ্যোগে প্রথম মেয়েদের স্কুল চালু হলেও ১৮১৯ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের উদ্যোগে গঠিত 'The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools'- এর আর্থিক সাহায্যে গড়ে ওঠা স্কুলগুলিই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি', 'বেঙ্গল খ্রিস্টান স্কুল সোসাইটি', চার্চ মিশনারি সোসাইটি' নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের এই উদ্যোগগুলি হিন্দু উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজ এবং দেশীয় শিক্ষা সংস্কারকদের কাছে সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য কখনোই হয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৪৯ সালে আমরা দেখতে পাবো 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। বেথুন সাহেব তার এই স্কুলে বিভিন্ন পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রথমে ইংরাজিকে প্রাধান্য দেননি। মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে তিনি একটি রূপরেখা তৈরি করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ'এর মাধ্যমে যখন নারীশিক্ষার জন্য আর্থিক অনুদান এবং বৃত্তির ব্যবস্থা কার্যকর হয় তখন থেকে বেথুনের ঐ রূপরেখাই

পরবর্তীতে গড়ে ওঠা মেয়েদের স্কুলগুলিতে প্রাধান্য পায়। বেথুন সাহেব যে রূপরেখা ঠিক করেছিলেন তা হল – ১) বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা। ২) অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে ইংরেজি ভাষা পড়ানোর বিষয়ে নিষেধাক্কা। ৩) সেলাই বা হাতের কাজের মত ব্যবহারিক শিক্ষা। ৪) অবৈতনিক শিক্ষা। ৫) দূর থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা। যে রূপরেখাগুলির কথা বলা হল তার মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষাকে বাদ দিয়ে দিলে বাকি যা কিছু পড়ে থাকে তা আসলে কৌশলগত পদক্ষেপ। অভিভাবকের যদি অনুমতি থাকে তাহলে ছাত্রীকে ইংরাজি শিক্ষা দিতে যে কোনো বাধা নেই তা কিন্তু পরোক্ষে বলে দেওয়া হল আসলে। পরবর্তীতে সরকারি সাহায্যে ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া, মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় যে স্কুলগুলি গড়ে তোলা হয় সেখানেও বেথুন সাহেবের ঠিক করে দেওয়া যে রূপরেখা তাকেই স্বীকার করা হয়েছে। স্কুলগুলি বেশিদিন টিকে না থাকতে পারলেও ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে নারীশিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ঠিক কতটা প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল তা ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

১৮৩৫ সালে মেকলের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে ইংরাজি শিক্ষা পাকাপাকিভাবে এদেশে তার প্রভাব বিস্তার করে। প্রাচ্যশিক্ষার জন্য যা কিছু মাধ্যম তাকে বাতিল করে এক এবং একমাত্র ভাষা ইংরাজিতেই শিক্ষার কথা বলা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার নতুন ভাষা হিসাবে যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল, তা ইংরাজি। রাধাকান্ত দেবের মতো বেশ কিছু অভিজাত ব্যক্তি সর্বসাধারণের শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগী হলেও অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইংরাজি শিক্ষা এবং বাংলা লিবারাল শিক্ষা বিষয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন। ফলে বাংলা ভাষার একটা মান্যরূপ তৈরি হয়ে যায় এবং একই

ভাষার মধ্যে আলাদা আলাদা ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। শুরু হয় ১৮১৭ সালে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'র মাধ্যমে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা এবং ইংরাজি ভাষায় বই ছাপানো। ইংরাজিকে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হলেও মাতৃভাষা বাংলাকে ভুলে যাওয়া বাঙালির পক্ষে পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। ইংরাজি যেহেতু একেবারেই অজানা ভাষা, সে ভাষাও কি বাঙালি ঠিকমতো শিখতে পেরেছে? হয়তো বাঙালি শিখে উঠতে পারেনি ইংরাজি এবং বাংলা ভাষার কোনটাই। শ্রী পরমেশ আচার্য জানাচ্ছেন ১৮৫৫ পূর্ববর্তী ইংরাজি স্কুলে প্রতি দশজন পড়ুয়ার নজনই সহজভাবে অভিধানের সাহায্য ছাড়া ইংরাজি পাঠে অপারগ।[১৮] তাই দেখা যাবে এই শতকেই বাঙালির মধ্যে একধরণের সচেতনতার বোধ তৈরি হবে। ইংরাজি এবং বাংলা ভাষাকে একই অবস্থানে রেখে দেখার জাতীয়তাবাদী মনোভাব তৈরি হবে। প্রাইমার লেখার মধ্য দিয়ে এই জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যাবে, এরকমটা বলা যেতে পারে হয়তো। এটা মাথায় রাখতে হবে ইংরাজিকেই বাঙালি স্বীকার করেছে মনেপ্রাণে। ইংরাজি যে আধুনিক হয়ে ওঠার একমাত্র অবলম্বন তা বাঙালি মনে করেছে। সঙ্গে যে বাংলা ভাষার কথা বলা হচ্ছে তাও আসলে একটা মান্যরূপ। বাংলা ভাষার এই মান্যরূপ আসলে ঔপনিবেশিক যে ইংরাজি শিক্ষা তার আদর্শকেই স্বীকার করে।

আমরা এই অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি 'ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার ও বাঙালির শৈশব'। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে মধ্যশ্রেণির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল সেই শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেকে এবং তার ভাবীকালকে নির্মাণ করতে চেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সেই শিক্ষার সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি তার ভাবীকালকে যুক্ত করতে চেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শিক্ষার সাথে বাঙালির শৈশবের সম্পর্ক কি তা বলার আগে আমাদের প্রথমেই জেনে নিতে হবে 'শৈশব কি?' কাকে বলে শৈশব? শৈশব বলতে আমরা বুঝি জন্মের পর থেকে কৈশোর কালের

পূর্ব সময়টাকে। শৈশবকালের ধারণাটি ১৭০০ সাল থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে উদ্ভব হয় বিশেষত দার্শনিক জন লক'এর শিক্ষা বিষয়ক মতবাদে। এর আগে শৈশবকালকে বড়োদের অসম্পূর্ণ সংস্করণ হিসাবে দেখা হত। ফরাসি ঐতিহাসিক ফিলিপ এরিজ বলেন শৈশবকাল প্রাকৃতিক বিষয় নয় বরং এটি সমাজের সৃষ্টি। শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে জন লক বিশেষ অবদান রাখেন। তার বিখ্যাত থিয়োরি 'টেবুলা রাসা'তে তিনি শিশুদের মস্তিষ্ককে খালি স্লেটের সাথে তুলনা করেন। পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে আধুনির দৃষ্টিভঙ্গি নির্মিত হয়। শিশুদের নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত রোম্যান্টিক যুগে। জাঁ জ্যাক রুশো তার বিখ্যাত বই 'Emile: or, On Education'এ শিশুদের প্রতি কিভাবে ব্যবহার, আচরণ করতে হবে তা প্রণয়ন করেন। জন লক ও ১৭০০ শতাব্দীর অন্যান্য চিন্তাবিদের মতো রুশো যা বলছেন তার মূলকথা এই যে শৈশব হচ্ছে সাবালকত্বের বাধা বিপত্তি মোকাবিলা করার আগের একটি ক্ষণস্থায়ী সময়।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শৈশবকালকে প্রথমে বড়োদের অসম্পূর্ণ সংস্করণ হিসাবে দেখা হত। পরবর্তীতে সেই চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। উনিশ শতকেই আমরা দেখতে পাবো শিশুর স্বাধীন স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব। উনিশ শতকে স্বাধীন স্বতন্ত্র পরিচয় হিসাবে শিশুর এই ধারণা তৈরি করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে 'শিক্ষা'। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পাঠশালা শিক্ষায় পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীকে 'ছোটো' বলে ধরা হত। কিন্তু ছোটোদের স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় ছিল না।[১৯] ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারের কালে 'ছোটো' বা ছোটোবেলার ধারনাগুলি 'শিশু' বা 'শৈশব'এ নতুন রূপে প্রকাশিত। উপনিবেশের যে 'শিশুর' ধারণা তা একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিচিতি। এখানে শিশুর পরিচিতি বয়স দিয়ে নির্ধারিত নয়। আসলে উনিশ শতকের যে শৈশব তা আসলে নিজের প্রয়োজনে নির্মাণ করা। ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারকালে শিশু বা শৈশব তা আসলে একটি বিশেষ মানসিকতার

ভিত্তিতে নির্মিত। বয়সের মাপ এখানে গুরুত্ব পায় না। উনিশ শতকে শিশু সামাজিক পরিচয়হীন প্রায় চিরন্তন একটা ধারণা। শিশু বা শৈশব এখানে এক ধরণের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা বড়োদের। ছোটোদের নয়।

উনিশ শতকের আগে অর্থাৎ প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে 'ছোটো'র ধারণার খোঁজ পাওয়া গেলেও শৈশবের ধারণার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের আগে শিশু ছিল বড়োদের অসম্পূর্ণ সংস্করণ। 'শৈশব' নামক যে ধারণা তা উনিশ শতকের নির্মিত ধারণা। এই শৈশবের ধারণা নির্মিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার হাত ধরে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের যুগোপযোগী নাগরিক হিসাবে বাঙালি তার ভাবীকালকে তৈরি করতে চেয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের উত্তরসূরী নির্মাণের জন্য বিদেশী শাসক ও তার এজেন্টদের লক্ষ্য হয়ে ওঠে উপনিবেশের শিশুরা। উপনিবেশের নতুন যে ভাবাদর্শ সেই নতুন ভাবাদর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয় শৈশব।

উনিশ শতকের যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে সে শিক্ষা সবার জন্য নয় তা আমরা জানি। এই ঔপনিবেশিক শিক্ষার সঙ্গে সমাজের গতরখাটা লোকজনের কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসারের যাবতীয় টানাপোড়েনের বাইরে অবস্থান করেছে। উনিশ শতকের এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা সমাজের একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। এই শিক্ষা কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের শিক্ষা। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষা বাংলার সব বাঙালির জন্য নয়। এখানে যে বাঙালির কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে তারা হল শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, মধ্যশ্রেণির বাঙালি। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারে এই বাঙালি তার শৈশবকে উপযোগবাদের আদর্শ করে তুলতে চেয়েছে। এই মধ্যশ্রেণির বাঙালি শৈশবকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্মাণ করতে চেয়েছে।

শিশুর নানামাত্রিক চলনকে একটা সুনির্দিষ্ট ঘেরাটোপে বেঁধে পরিকল্পনামাফিক ভাবে গড়তে চেয়েছে শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত শৈশবকে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার কারণে মধ্যশ্রেণির বাঙালির যে অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও উপযোগবাদের ধারণা তৈরি হয়েছিল সেই ধারণাকে যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য বাঙালি তার শৈশবকে নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে বাঁধতে চেয়েছে। এই বাঁধতে চাওয়ার মাধ্যম হল 'বই'। উনিশ শতকের এই সময়কালে আমরা দেখবো শিশুর নানামাত্রিক চলনকে একটা নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে আনার জন্য প্রাইমারের বিশাল আয়োজন। আমাদের জানাবোঝার মধ্যে আছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার কারণে বাঙালি যেমন তার অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিল তেমনভাবে আত্মসুখে পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছিল। তাই উনিশ শতকে বাঙালি জীবনে লেখাপড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষার যে পদ্ধতি ছিল সেই পদ্ধতির অভিমুখ পরিবর্তন হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগে এসে। শিক্ষার এই যে অভিমুখ পরিবর্তন তা আসলে বাংলা প্রাইমারের জন্মের প্রধান কারণ।

উনিশ শতকের যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা সেই শিক্ষার সাথে সমাজের একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির যোগ প্রবল। ফলত ঔপনিবেশিক শিক্ষার একটা শ্রেণি অভিমুখও আছে। এই শ্রেণি অভিমুখকে বজায় রাখতে যে সমস্ত বই রচনা করা হবে তার যে নির্দিষ্ট শ্রেণি অভিমুখ থাকবে সেটা স্বাভাবিক। উনিশ শতকের যে বিপুল প্রাইমারের কথা বলছি তারও একটা শ্রেণি অভিমুখ আছে। আসলে উনিশ শতকের যে শিক্ষা তার সাথে উপযোগবাদের এবং চাহিদার সম্পর্ক ছিল। ফলত শিক্ষার আদর্শও ছিল সেই অভিমুখে। উনিশ শতকে একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থার খোঁজ পাচ্ছি আমরা। আগেই উল্লেখিত হয়েছে ১৮১৩ সালের সনদ আইন চালু হবার পর দেশীয় শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন হয়। উপনিবেশের ভাবাদর্শ নির্ভর যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সেই শিক্ষাব্যবস্থায় একটা প্রথাবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী তৈরি করা হয় যা একটি সমরূপ শিক্ষাব্যবস্থার জন্ম দেয়। এই সমরূপ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বাংলাদেশের বহুমাত্রিক শিক্ষার বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে এক অভিন্ন ব্যবস্থার আওতাধীন হয়। আসলে উপনিবেশের শিক্ষায় যে প্রাইমারের কথা বলছি আমরা তা মূলত এই সমরূপ ভাষাশিক্ষার প্রকল্প। এই প্রাইমারগুলির মাধ্যমে ভাষার একটি মান্য বা আদর্শ রূপকে নির্দিষ্ট করা হয়।

বাঙালির যে শৈশবের কথা বলছি আমরা তা আসলে এই উপনিবেশিক শিক্ষার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা যেমন নিয়মতান্ত্রিক, প্রণালীবদ্ধ ঠিক তেমনভাবে বাঙালির শৈশবও নিয়মতান্ত্রিক ও প্রণালীবদ্ধ। এই প্রথাবদ্ধ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে যে প্রাইমারের কথা বলা হচ্ছে তাও আসলে এই প্রথাবদ্ধ শিক্ষার নিদর্শন। ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি উপযোগবাদের আদর্শ করে গড়ে তোলার জন্য এই প্রাইমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাঙালির শৈশবে।

প্রাইমারগুলি বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্যই। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে একটা শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্বটা শিশু তো শিখেই বিদ্যালয়ে আসে, তাহলে আলাদা করে প্রাইমারের কি প্রয়োজন? আসলে শিশুর শিক্ষার দুটি আলাদা পরিসর আছে। প্রথমত ‘প্রথাবদ্ধ শিক্ষা’, দ্বিতীয়ত ‘অপ্রথাবদ্ধ শিক্ষা’। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে এই দুই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু দেখা যাবে ঔপনিবেশিক শাসনকালে দেশজ পাঠশালাগুলিকে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে যখন ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’, বা ‘ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি’র আওতায় আনা হয় তখন কোম্পানি এই অপ্রথাবদ্ধ শিক্ষাকে কার্যত অস্বীকার করে। প্রথাবদ্ধ শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে এই বিদ্যালয়। নতুন এক ধরণের স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই ধরণের স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা উপযোগবাদী ভাবাদর্শের কারণে জনসমর্থন পেলেও তা সর্বজনীন হয়নি। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষা আসলে মধ্যশ্রেণির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। ফলে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য অবশ্য মাধ্যম হিসাবে প্রাইমারের দরকার ছিল।

ইংরাজি শিক্ষাকে এত ভালোভাবে গ্রহণ করার পরেও কেন বাঙালি মধ্যশ্রেণি প্রাইমার লেখার বিষয়ে উৎসাহী হল এ প্রশ্নও ওঠা স্বাভাবিক। আমরা জেনেছি এই প্রাইমারগুলির যারা লেখক তারা ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সংস্কার কর্মসূচীর সঙ্গে সহমত। আসলে এই যে বাঙালিদের কথা বলছি তারা হয়তো ইংরাজি শিক্ষার পাশাপাশি বাঙালির ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার যে ভাবাদর্শ এবং উপযোগবাদ তার সাথে শিশুর শৈশবকে যুক্ত করার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের ধারণাও এই শৈশবের মধ্যে প্রথিত করতে চেয়েছেন হয়তো। ব্যাপক ইংরাজি শিক্ষার ফলে দেশের যে গর্বের বিষয় সেগুলি সঙ্কুচিত হতে পারে এরকম আশঙ্কা শিক্ষিত সমাজে তৈরি হয়েছিল হয়তো। জাতির অস্থিত্ব বাঁচানোর দায় থেকেই হয়তো বাঙালি মধ্যশ্রেণি বাংলা প্রাইমার রচনা বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। বাংলা ভাষায় প্রাইমার রচনা হলেও এই প্রাইমারগুলির আদর্শ ছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষাই। ঔপনিবেশিক শিক্ষার মূল ভাবাদর্শকে এই প্রাইমারগুলির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। বাঙালির শৈশবও তাই তৈরি হয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার আদর্শেই।

পুরো উনিশ শতক জুড়ে যে বিপুল প্রাইমার লেখা হয়েছে তার ক্ষেত্রেও অবদান বিদেশীদের। প্রাইমার লেখার শুরু মিশনারিদের হাত ধরেই। ১৮৩৫ সালের আগে পর্যন্ত প্রাইমার লেখার ক্ষেত্রে কোনো বাঙালির দেখা পাওয়া যাবে না। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল রাজকর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যেই। কিন্তু বাংলার যে ঔপভাষিক বৈচিত্র্য তাকে পুরোপুরি রপ্ত করানো বেশ কঠিন ছিল। তাই দেখা যাবে বাংলার বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে ভাষার একটা আদর্শ রূপ তৈরি করার চেষ্টা হয়। এই আদর্শ রূপ পরবর্তীতে প্রাইমারগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে মিশনারিরা বুঝেছিল ধর্মপ্রচার করতে হলে মাতৃভাষায় শিক্ষাটা প্রয়োজনীয়। মিশনারিদের এই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে ১৮১৬ সালে ‘Hints Relative to Native Education’ নামে একটি পুস্তিকায়। ঐ

সময়কালে অর্থাৎ ১৮১৬-১৭ এই এক বছরের মধ্যে তারা তৈরি করছেন শতাধিক বিদ্যালয়। ছাত্রসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৭০০০-এর উপর। ১৮২৩ সালের মধ্যে ১৬০ টির বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন তারা। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা প্রথম ১২ পাতার একটা প্রাইমার প্রকাশ করলেন। প্রাইমারটির নাম 'লিপিধারা'। এই লিপিধারাকেই বর্ণশিক্ষার প্রথম বই বলে দাবি করছেন লঙ।

গোটা উনিশ শতকে যে বিপুল প্রাইমারের সম্ভার আমরা দেখতে পাই তা আসলে উপনিবেশের আদর্শকে প্রকাশ করে তা আমরা জেনেছি। উনিশ শতকের এই প্রাইমারগুলিকে আমরা পর্বে ভেঙে আলোচনা করতে পারি। ১৮০০ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সময়কালকে আমরা একটা পর্বের মধ্যে ফেলব। আমরা দেখেছি ১৮৩৫ সালে পর্যন্ত যা প্রাইমার লিখিত হয়েছে, তার সবটুকু অবদান বিদেশীদের। এই সময়কালে আমরা দেখবো ১২ পাতার 'লিপিধারা'র পাশাপাশি স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৮১৮ সালে 'বর্ণমালা' নামে একটি প্রাইমার প্রকাশ করছেন স্টুয়ার্ট। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইটিকে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর প্রথম প্রচেষ্টা বলে মনে করেন। এরপর ১৮৩৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বসু লিখছেন 'শব্দসার'। এই প্রাইমারটিই দেশীয় মানুষের লেখা প্রথম বর্ণমালা শেখার বই। ১৮৩৫ পর্যন্ত আমরা আর কোনো বাঙালির দেখা পাবো না যারা কিনা প্রাইমার লিখছেন।

১৮৩৫ থেকে ১৮৪৫ এই পর্বে দেশীয়দের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীরাও প্রাইমার লিখছেন। ১৮৩৫ সালে 'বঙ্গ বর্ণমালা' নামে একটি প্রাইমার প্রকাশিত হচ্ছে। ২৪ পাতার এই বইটি বেরিয়েছিল শ্রীরামপুরের তমোহর প্রেস থেকে। সম্ভবত মিশনারিদের লেখা বলেই ১৮৩৯ সালে স্থাপিত হিন্দু কলেজ পাঠশালা এবং ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে এই প্রাইমারটি গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে আশিস খাস্তগীর মহাশয় জানাচ্ছেন। এই সমস্ত পাঠশালার জন্য প্রকাশিত হচ্ছে 'শিশুসেবধি' এবং 'নতুন বর্ণমালা' (প্রথম খণ্ড ১৮৪০) এবং (দ্বিতীয় খণ্ড

১৮৪৪)। এই সময়কালে আমরা মিশনারিদেরকেও পাবো বাঙালিদের পাশাপাশি। এই সময়কালে অর্থাৎ ১৮৪১ সালে প্রকাশ পাচ্ছে 'জ্ঞানারুণোদয়'। বইটি ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। ১৮১৮ সালে লিখিত স্টুয়ার্ট-এর 'বর্ণমালা' বইটির দ্বিতীয় খণ্ড স্কুল বুক সোসাইটি বের করছে ১৮৪৬ সালে। এর পরবর্তীতে আমরা আর কোনো বিদেশীকে পাবো না যারা প্রাইমার রচনা করছেন।

১৮৪৫ থেকে ১৮৫৫ এই সময়কালে আমরা যে প্রাইমারগুলি পাবো সেগুলি আসলে শিশুর ভাষাশিক্ষার একটা রূপ তৈরি করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা তা আসলে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির সবাইকে যে গিলে ফেলতে চেয়েছিল তা দেখা যায়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক শিক্ষায় মেয়েদের যে অনুপস্থিতি আমরা দেখেছি উপনিবেশিক শিক্ষায় আমরা তার উল্টোটা দেখলাম। মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এই উনিশ শতকেই। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠা করছেন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। এই স্কুলের মেয়েদের ভাষাশিক্ষার জন্য 'শিশুশিক্ষা' লিখলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। 'শিশুশিক্ষা' একটি সিরিজ। এই সিরিজের প্রথম তিন ভাগ অর্থাৎ 'শিশুশিক্ষা' (প্রথম ভাগ), 'শিশুশিক্ষা' (দ্বিতীয় ভাগ), এবং 'শিশুশিক্ষা' (তৃতীয় ভাগ) লিখছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়। তিনটি ভাগের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫০। এই সিরিজের চতুর্থ ভাগ 'বোধোদয়' লিখছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সিরিজের পঞ্চম ভাগ 'নীতিবোধ' লিখছেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শিশুশিক্ষা' যে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত তা লেখক আখ্যাপত্রে নিজেই জানিয়েছেন। বইটি সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন যা বলেছেন তা লেখক আমাদের জানাচ্ছেন –

"শিশুশিক্ষা বইটি যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে সহসা আধুনিকতার আরুণালোকে নিয়ে এল। .... তিনি (মদনমোহন) মধ্যযুগীয় মানসিকতার অর্থাৎ চিরন্তন গতানুগতিকতার স্থলে আনলেন দেশকালপাত্র বিচারে যুক্তিপ্রয়োগের আদর্শ। প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি।"[২০]

১৮৫৫ সালের আগে কিছু প্রাইমার পাওয়া যাবে। এই সময়কালে বোমওয়েচ লিখছেন ‘ধ্বনিধারা’ (১৮৫৩)। ১৮৫৪ সালে ‘শিশুবোধোদয়’ লিখছেন জে. ইয়ুল। ১৮৫৫ সালে আমরা পাবো প্রাইমারের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রাইমার। আমরা পাবো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত ‘বর্ণপরিচয়’। প্রকাশিত ১৮৫৫ সালে। বর্ণপরিচয়ের দুটি ভাগ। বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে বাংলা প্রাইমারের গতিমুখ কোনদিকে বইবে তা ঠিক হয়ে গেছিল।

১৮৫৫ থেকে ১৮৬৫ এই সময়কালে আমরা পাবো আরো পঁচিশটির মতো প্রাইমার। এই দশ বছরের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য প্রাইমারগুলি আমরা পাবো সেগুলি হল সাতকড়ি দত্তের ‘প্রথম পাঠ’ (১৮৬২?), ‘দ্বিতীয় পাঠ’ (১৮৬২), ‘তৃতীয় পাঠ’ (১৮৬২?)। বাকি যা প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছে এই সময়কালে তার সবকটির লেখকের নাম জানা যায়না।

১৮৬৬ থেকে ১৮৭৭ পর্যন্ত সময়কালে প্রায় পঞ্চাশটির বেশি প্রাইমার প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রাইমারগুলি হল গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বর্ণশিক্ষা-১/২’ (১৮৬৭, হিতৈষী প্রেস), রামগতি ন্যায়রত্নের ‘শিশুপাঠ’ (১৮৬৮, বুধোদয় প্রেস), মথুরানাথ তর্করত্নের ‘বর্ণবোধ’ (১৮৬৯, প্রাকৃত প্রেস), মহ. জুহুরুদ্দিনের ‘জ্ঞানশিক্ষা’ (১৮৬৯, সুলভ প্রেস), হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের ‘বর্ণপরীক্ষা’ (১৮৭৩, বিজয়রাজ প্রেস)।

শিশুপাঠ্য বর্ণশিক্ষার বই প্রচুর পরিমাণে লেখা হল পরবর্তী দশ বছরে অর্থাৎ ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত। এই সময়কালে নতুন বই লেখা হয়েছে সত্তরটির মতো। পঁচাত্তরটির মতো বই আবার পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য প্রাইমারগুলি হল অক্ষয়কুমার রায়ের ‘বর্ণের পরিচয়’ (২ ভাগ), উদয়কৃষ্ণ দত্তের ‘নব শিশুপাঠ’ (৩ ভাগ), উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘নব শিশুশিক্ষা’ (৩ ভাগ), মদনমোহন সরকারের ‘বালকশিক্ষা’ (২ ভাগ), রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর ‘অক্ষরশিক্ষা’ (২ ভাগ), রাখালচন্দ্র চক্রবর্তীর ‘নববর্ণপরিচয়’ (২ ভাগ), শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘শিশুবোধ’ (২ ভাগ) ইত্যাদি। এছাড়াও আরো প্রচুর প্রাইমারের দেখা পাওয়া যাবে এই সময়কালে।

পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৭ এই দশ বছরেও প্রাইমার রচনার প্রয়াস একইরকমভাবে চলেছে। এই দশ বছরে প্রায় একশোটির কাছাকাছি প্রাইমার লেখা হচ্ছে। এই সময়কালে উল্লেখযোগ্য প্রাইমারগুলি হল যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা' (১৮৯১), 'শিশুপাঠ-১/২' (১৮৯১), দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানোদয়' ও 'বর্ণবোধ-১/২' (১৮৯০), যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বর্ণমালা পরিচয়-১/২/৩ (১৮৯১-৯৩), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'সচিত্র বর্ণপরিচয়-১' (১৮৯২), ঈশানচন্দ্র দেবশর্মার 'প্রথম শিক্ষা বর্ণপরিচয়-১/২' (১৮৯৮) ইত্যাদি।

আসলে উনিশ শতকের পুরোটা সময় জুড়ে প্রাইমার রচনার জোয়ার উঠেছিল। এই একশো বছরে প্রায় ৫০০ টিরও বেশি প্রাইমার লিখিত হচ্ছে।[২১] এই প্রাইমারগুলি শিশুকে বর্ণশিক্ষার প্রথমিক পাঠ দেবার পাশাপাশি লিখতে ও পড়তে শেখায়। এই প্রাইমারগুলির মধ্য দিয়ে ভাষার শুদ্ধরূপ শেখানো হচ্ছে। ভাষার এই শুদ্ধরূপ আসলে কোম্পানির ঠিক করা। কোম্পানি ভাষার যে আদর্শ বা মান্য রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছিল ঔপভাষিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে, তাই আসলে প্রকাশিত এই প্রাইমারগুলির মধ্যে দিয়ে। এই প্রাইমারগুলির মধ্য দিয়ে শিশুকে আধুনিক শিক্ষার সাথে পরিচয় করানো হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সুনাগরিক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিশুর ভাষাশিক্ষাকে নিয়মতান্ত্রিকতার বশবর্তী করে তোলা হচ্ছে।

আমরা আগেই বলেছি উনিশ শতকে বাঙালি তার শৈশবকে নির্মাণ করতে চেয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার যে আদর্শ, ভাবাদর্শ তার সাথে সম্পৃক্ত করে। উনিশ শতকের কালজয়ী যে প্রাইমারগুলি অর্থাৎ 'শিশুশিক্ষা', 'বর্ণপরিচয়' ইত্যাদি প্রাইমারগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালি তার শৈশবকে নির্মাণ করতে চেয়েছে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অবলম্বন করে। এই প্রাইমারগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো শিশুদেরকে বর্ণশিক্ষা দেবার পাশাপাশি এখানে যে আখ্যানগুলি যোগ করা হচ্ছে সেই আখ্যানগুলিতে ভালো এবং খারাপের একটা বিপরীত অবস্থান তৈরি করা হচ্ছে। খারাপ গুণগুলিকে সামনে এনে ভালো কিভাবে হতে হয় তার শিক্ষা

দেওয়া হচ্ছে শিশুকে। বর্ণপরিচয়ে 'গোপাল' তৈরির যে নির্দিষ্ট নিয়ম বর্ণনা করা আছে তা আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগবাদের কথা বলে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা শিশুর যে বাধ্যতা চায় সেই বাধ্যতা বলা আছে এই প্রাইমারগুলিতে। আসলে উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি নিজের মাধ্যমে এবং শিক্ষকের মাধ্যমে শিশুকে উপনিবেশের উপযোগবাদের যথার্থ সৈনিক হিসাবে প্রকাশ করতে চেয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে

"সরকারদের একটি ছেলে আছে। তার নাম রাখাল। রাখালের বয়স সাত বছর। ঘোষালদের গোপাল যেমন সুবোধ রাখাল তেমন নয়। রাখার বাপ মার কথা শুনে না। যা খুসী হয় তাই করে। সারা দিন উপদ্রব করে। ছোট ছোট ভাই ভগিনী গুলির সহিত ঝগড়া করে তাহাদিগকে মারে। এজন্য তার বাপ মা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে। আর আর বালকের সহিত ঝগড়া করে। মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসে। রাখাল দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে। বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে একবারও পড়ে না। এদিক ওদিক চাহিয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে গোল করিয়া অন্য অন্য বালকদিগকেও পড়িতে দেয় না।"[২২]

একইরকমভাবে যদি আমরা দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠের দিকে নজর দিই তাহলে সেখানে দেখবো 'রাখাল'এর বৈশিষ্ট্যের একেবারে বিপরীত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত 'গোপাল' কে হাজির করা হচ্ছে। আমরা যদি প্রথম পাঠের দিকে নজর দিই তাহলে সেখানে 'গোপাল' কে নিয়ে যা কথা বলা হচ্ছে তা এরকম –

"ঘোষালদের একটা ছেলে আছে। তার নাম গোপাল। গোপালের বয়স ছ বছর। গোপাল যা পায় তাই খায় যা পায় তাই পরে। ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। তার বাপ মা যখন যা বলেন তাই করে কখন তাঁদের কথা অন্যথা করে না। ভাই ভগিনী গুলিকে অতিশয় ভালবাসে। কখন তাদের সহিত ঝগড়া করে না ও তাদের গায়ে হাত তোলে না। এজন্যে তার পিতা মাতা তাকে বড় ভাল বাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায় পথে খেলা করে না এবং মিছামিছি দেরি করে না। পাঠশালায় গিয়া আপনার জায়গায় বসে। আপনার জায়গায় বসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে থাকে। যাবত পড়া অভ্যাস না হয় অন্য দিকে চায় না। যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন মন দিয়া শুনিতে থাকে।"[২৩]

আসলে এই যে দুটি আলাদা আলাদা গুণ সমন্বিত চরিত্রের কথা বলা হল, এই দুটি চরিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য আসলে 'গোপাল'। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষা আসলে 'গোপাল'কে নির্মাণ করতে চেয়েছে। উপযোগবাদের আদর্শ হিসাবে বাঙালিও আসলে নির্মাণ করতে চেয়েছে 'গোপাল'কেই। দুটি চরিত্রকে পাশাপাশি রেখে প্রতিমুহূর্তে গোপালকেই পেতে চেয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

প্রত্যেক শিশুর ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা মুখ্যত স্বতঃস্ফূর্ত। নির্মাণের অবকাশ এখানে থাকে না। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার পরবর্তীতে বাঙালি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তার পরবর্তী প্রজন্মকে এই শিক্ষার প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে চেয়েছে। শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত শৈশবকে একটা নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে এনে উপযোগবাদের আদর্শ করে তুলতে চেয়েছে। শিশুমনের বহুধাবিভক্ত বিচিত্রমাত্রিক চলনকে একটা সরলরেখার মধ্যে এনে শৈশবকে নির্মাণ করতে চেয়েছে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি। আসলে এই প্রাইমারগুলির মাধ্যমে 'গোপাল' এবং 'রাখাল'এর একটা বাইনারি অবস্থান তৈরি করে কার্যত 'গোপাল'কেই গ্রহণ করেছে বাঙালি। তৈরি হচ্ছে বাঙালির 'শৈশব'।

উল্লেখপঞ্জি

১। পরমেশ আচার্য, *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, বইমেলা ২০০৯, পৃ. ১৬

২। তদেব, পৃ. ১৭

৩। তদেব, পৃ. ১৭

৪। তদেব, পৃ. ১৭

৫। তদেব, পৃ. ১৭

৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বাঙ্গালার ইতিহাস', *বিদ্যাসাগর রচনাসমগ্র,* ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ২৮৮

৭। Trautmann, Thomas R., *Aryans and British India*, University of California Press, 1977, p. 17

৮। Adam,W., *Report of the State of Education in Bengal*, Basu, Anathnath (Ed.), University of Calcutta, p. 18-19

৯। Hunter, W.W., *Report of the Education Commission of India*, 1884, p. 69

১০। Adam,W., *Report of the State of Education in Bengal*, Basu, Anathnath (Ed.), University of Calcutta, p. 41

১১। Ghosh, S.C., *The History of Education in Modern India*, 1757-1986, Orient Longman, Hyderabad, 1955, p. 20

১২। Adam,W., *Report of the State of Education in Bengal*, Basu, Anathnath (Ed.), University of Calcutta, 1941 p. 192

১৩। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস,* কলকাতা, কারিগর, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ. ১২৯

১৪। Hunter, W.W., *Report of the Education Commission of India*, 1884, p. 31, 59

১৫। Lusihington, Charles. *The History Design and Present State of the Religious Benevolent and Charitable Institution Founded by British in Calcutta and its Vicinity*, Calcutta, 1824, p. 16

১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* ১৮৩০-১৮৪০, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩৩

১৭। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র উদ্দ্যোগে আরপুলি পাঠশালা গঠিত হয়। ডেভিড হেয়ার এই পাঠশালাটির ব্যয়ভার ব্যক্তিগতভাবে বহন করতেন। ১৮২৯ সালে সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে এই পাঠশালায় দু'শ পঁচিশজন পড়ুয়ার জন্য একজন পণ্ডিত ও চারজন দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' ১৮৪০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয় দত্তের উদ্দ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮। পরমেশ আচার্য, *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১১, পৃ. ১৬১

১৯। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থায় উপনয়নের পরেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শিক্ষা শুরু হত। সাধারণত ব্রাহ্মণের আট, ক্ষত্রিয়ের এগারো এবং বৈশ্যের বারো বছর বয়সে উপনয়ন হত। বাংলায় রঘুনন্দন ও চৈতন্যের সমকালে বিদ্যারম্ভ সংস্কারের পর ছোটোদের লেখাপড়া শুরুর বয়স পাঁচ বা তার অধিক হওয়া স্বাভাবিক। কারণ হাতে খড়ি বা বিদ্যারম্ভ সংস্কার পাঁচ বছরের আগে হত না। মুসলমান সমাজে বারো বছর চার মাস বয়সে বিসমিল্লা সংস্কারের পর পড়াশোনা শুরু হত। মধ্যযুগে বাংলায় লিখিত সাহিত্যে যেসব নমুনা বা পুথি রয়েছে সেখানে পাঠশালা শিক্ষায় পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কথা পাওয়া যায়।

২০। আশিস খাস্তগীর, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৫

২১। তদেব, পৃ. ১৩-২৬

২২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বর্ণপরিচয়', দ্বিতীয় ভাগ, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ*, আশিস খাস্তগীর (সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৯০

২৩। তদেব, পৃ. ২৮৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈশব নির্মাণ প্রকল্পনায় রূপকথা-উপকথার ভূমিকা

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্ত শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্ত বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজ কৃত রচনা।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাটিকে যথার্থভাবে ধরে নিয়ে এগোলে এ কথা বলাই যায় শিশু হাজার বছর আগে যেমন ছিল আজও একইরকম আছে। শিশুর শৈশব যে নির্মাণ করতে হয়, তাকে ছোটো থেকেই আমাদের জটিল মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নিতে হয়, এ ভাবনা উনিশ শতকের আগে চিন্তাভাবনার মধ্যে আসেনি। শিশু বড় হবে, সময়ের সাথে সাথে তার মধ্যে ধ্যানধারণার প্রসার ঘটবে, সেটাই আসলে স্বাভাবিক। চক্রাকার প্রক্রিয়ায় তার জীবন এগোবে- এটাই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রাক্‌লগ্ন থেকে শিশু নিয়ে ধারণার পরিবর্তন ঘটছে। শিশুর শৈশব নির্মাণ করতে হবে, এই ভাবনার সূত্রপাত আসলে উনিশ শতকেই। শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত শৈশবে হস্তক্ষেপ করে শিশুকে ছোটো থেকেই আমাদের মতো করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার সূচনালগ্ন অর্থাৎ উনিশ শতকেই।

"কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল 'আধুনিককাল' দুরদেশগত নবীন জামাতার মতো নূতন চালচলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্তনের হাত পড়িয়াছে।"[২]।

এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে সময় পাল্টেছে। 'আধুনিক যুগ' নামক একটা ধারণার আমদানি হয়েছে। শুধুমাত্র শহরে নয়, গ্রামেও পরিবর্তনের প্রবাহ শুরু হয়েছে। এই পরিবর্তনে অন্য সব কিছুর সাথে শিশুর প্রকৃতির ও যে পরিবর্তন করতে হবে, শিশুর স্বাভাবিক শৈশবে যেমন করে হোক প্রবেশ করতে হবে, শিশুকে আধুনিক যুগের উপযোগী করে তুলতে হবে-এরকম ইচ্ছের ও আমদানি হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় হল 'শৈশব নির্মাণ প্রকল্পনায় রূপকথা-উপকথার ভুমিকা'। শিশুর 'শৈশব' নির্মাণে 'রূপকথা-উপকথার' ভূমিকা কি তা বলার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে রূপকথা-উপকথাগুলি একত্র করার প্রয়োজন পড়লো কেন? রূপকথা-উপকথাগুলি তো হাজার বছর ধরে মানুষের মুখে মুখে তার মৌখিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছে, তাকে আবার নতুন করে লিখিত রূপ দেবার কি দরকার? রূপকথা-উপকথার সংকলন করতেই হবে, এ দাবি কেন এতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো?

প্রসঙ্গত মনে পড়বে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র ভূমিকা অংশটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিকা অংশে প্রথম বাক্য শুরু করছেন এই বলে যে -

"ঠাকুরমা'র ঝুলিটির মতো এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?"[৩]

উল্লিখিত বাক্যে একটি শব্দ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দটি হল 'স্বদেশী'। 'স্বদেশী' বলতে এখানে আমরা আমাদের নিজস্ব, একেবারেই ঘরের জিনিসকে বুঝবো। 'স্বদেশী' শব্দটি ব্যবহার করার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও রয়েছে। যে মৌখিক সাহিত্যগুলি এতদিন পর্যন্ত আমাদের মুখে মুখে ফিরতো, যেগুলিকে আসলে কোনোদিন 'স্বদেশী' বলে দাগিয়ে দেবার প্রয়োজন পড়েনি তাকে হঠাৎ লেখ্যরূপ দিয়ে 'স্বদেশী' বলে প্রচার করা হল। এই মৌখিক সাহিত্যগুলি আমাদের ঘরের সম্পদ, আমাদের ঐতিহ্যের রক্ষাকবচ-এরকম বলতে শুরু করলেন সে যুগের বিদ্বজনরা। ঐতিহ্যের রক্ষাকবচ হতে গেলে কি এই সাহিত্যগুলিকে লেখ্যরূপ দেওয়াটা বাধ্যতামূলক? কথ্যঐতিহ্যে কি এই সাহিত্যগুলি পুরোপুরি 'স্বদেশী' ছিল না? নাকি লেখ্যরূপ না দিলে এই সাহিত্যগুলিকে 'স্বদেশী' বলার জোরটা এতটাও পাওয়া যাচ্ছিল না?

রূপকথা-উপকথা, যেগুলিকে কথ্যরূপ থেকে লেখ্যরূপে রূপ দেওয়া হল, আসলে এগুলির মধ্য দিয়ে হয়তো জাতীয়তাবাদের ধারণাটি খোঁজার চেষ্টা চলেছে। আমরা খুঁজে দেখতে চেয়েছি আমাদের ইতিহাস। কি ছিল আমাদের সমাজ। কেমন ছিল আমাদের বাঁচার ধরণ, আচার-

ব্যবহার, রীতি-নীতি। কার্যত এই সাহিত্যগুলির মধ্য থেকে আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসকে আবার নতুন করে খুঁজে পেতে চাইছি।

'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র ভূমিকাটিতে আবার যদি আমরা নজর দিই, তাহলে দেখবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে ভূমিকায় বলা কথাগুলি একটা নির্দিষ্ট অংশের মানুষের জন্য বলছেন। তাঁর বলার লক্ষ্য সমাজের সব অংশের মানুষ নয়, একটা নির্দিষ্ট অংশের মানুষ। যাদেরকে আমরা সম্মানজনক পরিভাষায় বলতে পারি 'শিক্ষিত ভদ্রলোক'। গল্পগুলি যে জায়গা থেকে, সমাজের যে অংশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সমাজের সে অংশের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লক্ষ্য নয়। ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসারের ফলে যারা নব্য শিক্ষিত, দেশীয় ঐতিহ্য থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন যারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথাগুলি বলেছেন। তিনি ভূমিকায় বলা কথাগুলির মাধ্যমে এটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারের ফলে বাঙালিদের রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। চিন্তা ও মননের ধরণ পাল্টে গেছে। বদলেছে মানসিকতা, বদলেছে দৃষ্টিকোণ, বদলে গেছে জীবনবোধ।

"পাল পার্বণ গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মতো শুকাইয়া আসাতে, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্কলোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে। তাহার পর দেশের শিশুরাও কোন পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল। তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এমন নীরব কেন? তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিন-দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যায় তাহাতে কেবল বিলাতী বানান-বহির বিভীষিকা। মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলই ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে!

কেবলই বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল! দেশলক্ষীর বুকের কথা কোথায়!

এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী-বালকদের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ

করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।"[৪]

এই অংশটুকু থেকে এটা আমরা বুঝেছি যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশের কারণে বাঙালি জাতি তার পুরনো যা কিছু ঐতিহ্য যেমন গান, যাত্রা, পালা, পার্বণ সব কিছু ভুলতে বসেছে। হারাতে বসেছে। স্নেহময়ীর মুখের কথা হারিয়েছে। হারিয়েছে দেশলক্ষীর বুকের কথা। যে রূপকথা-উপকথা রাজা থেকে কৃষক সবাইকে সমান ভালোবাসায় মানুষ করেছে, শিশুকে চাঁদ দেখিয়ে ভুলিয়েছে, ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করেছে, সেই রূপকথা-উপকথা যেন আজ দূর দেশের যাত্রী। এখানে বলা কথাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক্ষেপ আছে, হতাশা আছে। এই মৌখিক সাহিত্যগুলিকে আবার নতুন করে মনে করার চেষ্টা করা হোক, ফিরিয়ে আনা হোক পরিবর্তিত মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে, এরকম চাওয়া আছে। এই পুরাতনের দিকে ফিরে যাওয়া, ফেরার ইচ্ছে, আশা কি প্রচণ্ডরকমভাবে উদ্দেশ্যমূলক নয়?

বঙ্গসাহিত্যের এই যে পুরাতন সুর, যাকে নতুন করে ধরতে হবে, ফিরিয়ে আনতে হবে বলা হচ্ছে বারবার, এতদিন তা কিন্তু সবার কাছে উপেক্ষিত ছিল। গুরুত্বহীন ছিল। 'শিক্ষিত ভদ্রজন'এর কাছে এতদিন পর্যন্ত তা 'গ্রাম্য' ছিল। কিন্তু সেই গ্রাম্যদোষ ঝেড়ে ফেলার যে প্রয়াস চলছে তার প্রভাব রূপকথা-উপকথার উপরও পড়েছে। ইংরাজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অতীতে প্রত্যাবর্তন, মধ্যযুগের পল্লীগাথার রস-আস্বাদনের চেষ্টা এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল, তা আমরা জানি। বঙ্গসাহিত্যে এই যে অতীতের প্রতি মোহ নতুন করে তৈরি হয়েছে তার কিছু গুঢ় কারণ আছে।

"সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করে রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"[৫]

কারণ –

"ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকালপাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।"[৬]

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে এই রূপকথা-উপকথাগুলি যেগুলি আসলে মৌখিক ভাবে ছিল তা আসলে 'জাতীয় সম্পত্তি'। তাই তাকে সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

এছাড়াও বাঙ্গালীর মত রক্ষণশীল জাতির পক্ষে এটা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে 'জাতীয়তার' গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই এনলাইটেনমেন্টের সময়ে যখন যথার্থ স্বরূপ খোঁজা আবশ্যক হয়ে উঠেছে তখন অতীতের ওই গহন অন্ধকার থেকে মৌখিক সাহিত্যগুলিকে আলোকে টেনে আনা তা শুধুমাত্র মনের খেয়াল বা ভালোলাগা নয়। একরকমের পবিত্র কর্তব্যও। এ প্রসঙ্গে 'ছেলেভুলানো ছড়াঃ২'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বলা কিছু কথা আমাদের মনে পড়বে। তিনি বলছেন –

"রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারে না। কারণ ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলো রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগনের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে।"[৭]

ছড়ার মতো রূপকথা-উপকথাগুলির মধ্যে যে রসের প্রবাহ তা সকলের পছন্দ না হতেই পারে, কিন্তু এগুলি যে জাতীয় সম্পত্তি সে বিষয়ে যে কোন মতবিরোধ ছিল না। আসলে একটা সাহিত্য সংরূপকে যে সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হল, তা স্পষ্ট।

অতীতে ফেরার আরও একটা কারণ হিসাবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকে দেখতে পারি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের ফলে মানুষের জীবনে সমস্যা বেড়েছে। সামাজিক সমস্যা ছাড়াও প্রতিদিনকার ব্যক্তিগত সমস্যার ধরণ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। এটা ঠিক যে সময়ের সাথে সাথে দ্বান্দ্বিকতার চরিত্র বদলাবে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ধরণ বদলাবে, মানুষের বোঝাপড়া বদলাবে। আসলে অর্থনৈতিক ভিত

অর্থাৎ বেস যখন বদলাবে তখন উপরিকাঠামো তে পরিবর্তন হতে বাধ্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ কার্যত অর্থনৈতিক ভিত-এর পরিবর্তন। তাই মানুষের জীবনের সমস্যা অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে বেড়েছে। একক মানুষের সমস্যা বেড়েছে। বেড়েছে হতাশা।

তাই মানুষ ফিরতে চেয়েছে। ফিরতে চেয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতির ওই অতীত মোহের কাছে। ফিরতে চেয়েছে ওই গ্রাম্য সরলতার কাছে। ফিরতে চাওয়ার একটা দিক যদি হয় 'জাতীয়তাবাদ'এর জাগরন, স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া 'জাতীয় সম্পত্তি'র পুনরুদ্ধার; তাহলে অন্য দিকটি নিশ্চিতভাবে, বর্তমানের এই তীক্ষ্ণ, জটিল সমস্যা থেকে পালাবার একটা উপায় আবিস্কার। সমস্যার কঠিন বন্ধন থেকে নিজেকে আলগা করার একটা কৌশল। আসলে মানুষ এই রূপকথা-উপকথাগুলির কাছে গিয়ে সমস্যায় জর্জরিত হওয়া জীবন থেকে একটু স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছে। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চেয়েছে। একটু কম সমস্যা, একটু কম জটিলতা, একটু ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। রূপকথা-উপকথার রাজ্যের ওই সমস্যা বর্তমানের তীব্র সমস্যার থেকে অনেক বেশি সরল, অনেক সহজ। সমস্যার বহুমাত্রিকতা নেই, আছে একমাত্রিকতা। এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। অনেক সহজ সে জীবনে হিংসার ভয়াবহ রূপ নেই। আমাদেরকে ধ্বংসের খেলায় মত্ত করেনা এই রাজ্যের পরিবেশ। এখানে -

"আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরল এবং যুক্তিসংগতিহীন।"[৮]

এ তো গেল রূপকথা-উপকথা সংকলন করার দিক। জাতীয়তাবাদের দিক। সমস্যা থেকে মানুষের পলায়নের কৌশলের দিক। জাতীয় সম্পত্তিকে একত্র করার দিক। এই সব দিকের সাথে তো ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই ইতিহাসের সাথে 'শিশু'র সম্পর্ক কি? এই ইতিহাসে 'শিশু' কোথায়? কোথায় শিশুর 'শৈশব'? আমাদের আলোচনার বিষয় তো

জাতীয়তাবাদ নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় শিশুর 'শৈশব'। আলোচ্য শৈশব নির্মাণে 'রূপকথা-উপকথা'র ভূমিকা।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারপর্বে আমরা প্রথম লাভ করেছি 'শিশু'র ধারণা। শিশুর 'শৈশব' নির্মাণ করার ভাবনা তো অনেক পরের। শিশুর 'শৈশব' যে নির্মাণ করতে হয়, এরকম ধারণা, চিন্তাভাবনা কোনোদিন আমাদেরকে ভাবিত করেনি। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই আমরা শিশুর শৈশব নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করলাম। শিশুকে আধুনিক 'নর্ম'এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে তা আমাদের জটিল মানসিকতার মধ্যে চলে এল। শুরু হল শৈশব নির্মাণ নিয়ে আলোচনা। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮১৭ সালে স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর ঔপনিবেশিক শিক্ষা পাকাপাকিভাবে এদেশে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। তৈরি হতে শুরু করেছে শিশুশিক্ষা বিষয়ক নানা লেখাপত্র। লেখা হচ্ছে নতুন নতুন প্রাইমার। আমরা দেখেছি গোটা উনিশ শতক এবং তার পরবর্তীতে প্রায় ৫০০ টিরও বেশি প্রাইমার লেখা হচ্ছে। সব প্রাইমার-এর মূল বিষয়বস্তু একটাই। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগী করে তোলার জন্য শিশুকে ছোট থেকে গড়তে হবে কেমনভাবে। উল্লেখযোগ্য প্রাইমারগুলি যেমন 'বর্ণমালা'(১ম খণ্ড), 'বর্ণমালা'(২য় খণ্ড), 'শিশুশিক্ষা'(প্রথম ভাগ), 'শিশুশিক্ষা'(দ্বিতীয় ভাগ), 'শিশুশিক্ষা'(তৃতীয় ভাগ), 'বোধদয়' 'বর্ণপরিচয়'(প্রথম ভাগ), 'বর্ণপরিচয়'(দ্বিতীয় ভাগ)- ইত্যাদি প্রাইমারগুলির দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে সব প্রাইমারগুলির মূল উদ্দেশ্য একটাই। তা হল শিশুর 'শৈশব' নির্মাণের পন্থা। কী কী বলাতে হবে, কী কী কাজ করাতে হবে, তার এক বিশাল ফর্দ এই সব প্রাইমারগুলোর প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে।

'শিশুশিক্ষা'র প্রথম ভাগের একটা লেখা এরকম –

“পিতামাতার সেবা কর, তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহাই করিবে। গুরুলোকের উপদেশে অবহেলা করিও না, যাহারা তোমার একপাঠী তাহাদের সহিত কখন কলহ করিও না, কাহাকেও কটু কথা কহিও না।”[৯]

আবার ‘শিশুশিক্ষা’র তৃতীয় ভাগের একটা লেখার দিকে নজর দেওয়া যাক। সেখানেও -

“সুশীল ও সুবোধ বালক সর্বদা লেখা পড়া করে। সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। পাঠের সময় সে যেমন পাঠ বলিতে পারে আর কেহই তেমন পারে না। এজন্য গুরু মহাশয় তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকেন। সে কখনো মন্দ কম্ম করে না ও মন্দ কথা মুখে আনে না। গুরু লোকেরা তাহাকে যাহা বলেন সে তাহাই করে। কদাচ কথার অবাধ্য হয় না। তাহাকে যে কম্ম করিতে একবার নিষেধ করা যায় তাহা কখন করে না। সুতরাং সে সকলের প্রিয় হয়।”[১০]

সিদ্ধান্ত একটাই ‘সকলের প্রিয় হয়’। প্রিয় হবার জন্য উল্লিখিত কথাগুলি মেনে চললেই হল। এরকম নীতিবাক্য প্রতিটি প্রাইমারের প্রতিটি বাক্যে আছে। আসলে প্রাইমারগুলির মধ্যে বাধ্যতা আছে। নির্মম নতিস্বীকার আছে। এই প্রাইমারগুলি মূলত নির্দেশমূলক, কার্যত যা চায় রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগী ‘বাধ্য’ শিশু।

প্রাইমারগুলির মধ্যে এই যে একপ্রকার বাধ্যতার প্রশ্ন, এক ধরণের কঠোর শৃঙ্খলার প্রশ্ন, ধৈর্য ও মনোযোগের প্রশ্ন চলে এল- তা আসলে জোর করে চাপানো। এই বাধ্যতা, কঠোর শৃঙ্খলা, ধৈর্য, মনোযোগ সবগুলিকে যদি যথাযথভাবে চাপাতে হয়, তাহলে এই প্রাইমারগুলির পাশাপাশি এমন কিছু লাগবে যেগুলি এই অনুশাসন গুলিকে কৌতূহল উদ্দীপক করে তুলবে। চিত্তাকর্ষক এমন কিছু লাগবে যেগুলি এই কঠোর অনুশাসনকে অনুশাসন বলে মনেই করাবে না। আর এই কারণেই রূপকথা-উপকথার অবতারণা। উনিশ শতকের শৈশব নির্মাণ প্রকল্পনায় নীতিকথা সমৃদ্ধ প্রাইমারগুলি যেমন আছে, তেমনভাবে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশি’(১ম ভাগঃ১৮৯৭,২য় ভাগঃ১৯০৪) রয়েছে। ‘সহজ পাঠ’(১৯৩০) যেমন আছে,একইরকম ভাবে ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’(১৯০৭), ‘বাংলার উপকথা’(১৮৮৩), ‘রাঙাদির রূপকথা’(১৯৭০)-ও আছে।

রূপকথা-উপকথার মোহময় জগত শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দাবি করে, এটা যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে তার ঠিক পরেই একটা প্রশ্ন তৈরি হবে। আমরা তো চাইছি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগী 'বাধ্য' শিশু।কিন্তু এই উপযোগবাদের কোন ইঙ্গিত, ইশারা তো রূপকথা-উপকথার মধ্যে পাওয়া যাবে না। রূপকথা-উপকথার সবটাই তো অলৌকিক, অবাস্তব। বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন। রূপকথা-উপকথার বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান অভিযোগ এর অলৌকিকতা, এর অবাস্তবতা। কিন্তু কোনো কিছু বাস্তব না হলেই যে তার পৃথিবীতে কোনো জায়গা নেই, একথাও বলা যায় না।

"অবশ্য বাস্তব না হইলেই যে কাহারও পৃথিবীতে স্থান নেই, এ কথা কেহ বলেন না। সংসারে অবাস্তবেরও একটা প্রয়োজন আছে। মাটির সহিত যোগ না থাকিলে, মাটিতে শিকড় না গাড়িলেই, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে না আসিলেই কাহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও মানবমন হইতে নির্বাসন করা যায় না। নীল আকাশ অবাস্তব হইলেও ইহা শত নিগূঢ় বন্ধনে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত আপনাকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহা আমাদের তুচ্ছ, বিড়ম্বিত জীবন-নাটকের উপর সমুজ্জ্বল চন্দ্রতাপের মতো বিস্মৃত; ইহা আমাদের উগ্র কল-কোলাহলের উপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়; ইহার ঘন নীলরূপের দিকে চাহিয়া আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহ ও অশান্ত প্রকৃতি মাথা নত করে।"[১১]

আসলে আমরা শৈশবের ওই সময়কালকে পেরিয়ে এসেছি। বোধ বুদ্ধির বিকাশ ঘটে গেছে। সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারি। পাওয়া- না পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে জানি আমরা। পৃথিবী আমাদের কাছে তার সমস্ত রহস্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাই রূপকথা-উপকথার গল্পগুলি আমাদের কাছে কাল্পনিক মনে হবেই। মনে হবে সবটাই বানানো। প্রকৃত রসের সন্ধান যে এগুলির মধ্য থেকে পাব না, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই রূপকথা-উপকথার গল্পগুলি শিশুমনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে তা বুঝতে হলে আমাদেরকে আমাদের বোঝাপড়ার জায়গা থেকে নেমে আসতে হবে। শিশুর মনোজগতের সঙ্গে

নিজেদেরকে একাত্ম করতে হবে। সর্বোপরি আমাদের বুঝতে হবে শিশুর 'মন'কে। শিশুর মনকে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বাঁধা যায় না। আসলে -

"মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। সুসংলগ্ন কার্যকরণসূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য।"[১২]

শিশুমনের উপর রূপকথা-উপকথার মায়াময় জগতের প্রভাব বোঝাতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন –

"শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে তাহাতে পৃথিবীর সমুদয় রহস্য যেন নীড় রচনা করে; তাহার চিন্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে, অন্ধকারে তারার মত, নানাবর্ণের আকাশ-কুসুম ফুটিয়া থাকে। পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখন তাহার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙিন নেশায় সে সর্বদা মশগুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্তবিস্তৃত, বাঁধাবন্ধনহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্যে, যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।"[১৩]

রূপকথা-উপকথা আসলে শিশুকে এমন একটি রহস্যময় জগতের বাসিন্দা করে তোলে। রূপকথা-উপকথার ওই রহস্যময় বাসিন্দাদের আমাদের কাছে খুব সহজ সরল বলে মনে হলেও শিশুর কাছে ওই জগত, জগতের বাসিন্দা অন্য মাত্রা বহন করে আনে।

এখানে এখন একটা তুলনামূলক আলোচনা টানার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন এই কারণে নয় যে, প্রাইমারগুলি এবং রূপকথা-উপকথাগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখানো। প্রয়োজনের কারণ এই যে প্রাইমারগুলির মাধ্যমে 'শৈশব' নির্মাণের প্রক্রিয়াটা সার্বিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। 'বর্ণপরিচয়'-এ বিধিবদ্ধ 'গোপাল' তৈরির যে পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি নির্দেশ করা আছে, সেই সুবোধ বালক 'গোপাল' তৈরিতে কোথাও একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেই ফাঁকটিকে পূরণ করছে রূপকথা-উপকথা। এই তুলনামূলক আলোচনায় প্রাইমারগুলির 'গোপাল' নির্মাণের ফাঁকগুলি কি

তা খোঁজার চেষ্টা করবো আমরা। সঙ্গে রূপকথা-উপকথার সংকলন কীভাবে সেই ফাঁক পূরণে সহায়তা করছে তাও বলার চেষ্টা করবো।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই প্রাইমার রচনার যে ঢল নেমেছিল তার মধ্যে বেশ কিছু প্রাইমার কালজয়ী হয়েছে। কালজয়ী হলেও সমস্যা থেকে গেছে কিছু কিছু জায়গায়। 'বর্ণপরিচয়'এর আগে পর্যন্ত প্রকাশিত প্রাইমারগুলির প্রথম সমস্যা হিসাবে আমরা দেখেছি যে এখানের বড় ও ক্রিয়াযুক্ত বাক্যগুলি মূলত সাধুভাষায়। দ্বিতীয় সমস্যা হিসাবে দেখেছি প্রাইমারগুলির কোথাও ছড়া বা কবিতার ব্যবহার নেই। শিশুকে ছন্দের দোলা দিয়ে আমন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টা নেই। তৃতীয় সমস্যা হিসাবে দেখেছি যে প্রাইমারগুলিতে অপরিচিত বহু শব্দ থাকলেও পাঠ অংশে শিশুর অভিজ্ঞতার জগত খুব সীমাবদ্ধ। বাড়িতে ভাইবোনের সঙ্গে খেলা, পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের উপদেশ শোনা, ঝগড়া করবে না, মারামারি করবে না, সবার কথা শুনে চলবে- এ সমস্ত কথার বাইরে দেশ সমাজের কোনো সংবাদ নেই। চতুর্থ সমস্যা হিসাবে আমরা বলতে পারি প্রাইমারগুলির যে চরিত্রগুলি আছে শুধুমাত্র তাদের কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। গোপাল কি কি করে, গোপাল হতে হলে কি কি করা উচিত-এসব কথা আছে। বিবরণ আছে। কোনো গল্প নেই। পঞ্চম সমস্যা হিসাবে দেখা যায় প্রাইমারগুলিতে শিশুর কল্পনাকে নির্মাণ করার জন্য কোনো উপকরণ নেই। রূপকথা-উপকথা ভিত্তিক পাঠ নেই। কোনো নিসর্গ সৌন্দর্যের বর্ণনা নেই। সবকিছু ছাড়িয়ে যে সমস্যা অত্যন্ত বেশি করে আছে প্রাইমারগুলিতে তা হল বইগুলির প্রতিটি পাতা জুড়ে আছে প্রবল নীতিশিক্ষার বোধ। ভালো ও সুবোধ ছেলের, যে কিনা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপযোগী হবে- সেরকম একটা আদর্শ 'ধরণ' তৈরি করতে পারলেই যেন লেখকের নিশ্চিন্তি। লেখকরা ধরেই নিয়েছেন এটা প্রচণ্ড রকম আনুগত্য শিক্ষা। এই শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ, আকর্ষণের বা উপভোগের কোনো যোগ নেই।[১৪]

অন্যদিকে রূপকথা-উপকথার কাহিনীগুলি শিশুকে প্রতিমুহূর্তে এক নতুন রাজ্যের অধিবাসী হবার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দেয়। যতই হোক সেটা রূপকথার স্বপ্নের রাজ্য, কিন্তু সেই রাজ্যের অধিবাসী হতে তো কোনো বাধা নেই! রূপকথা-উপকথার মধ্যে এক কুহেলিকাময় প্রদেশ আছে, যেখান থেকে সমস্ত রঙিন অসম্ভব কল্পনার আলো বিচ্ছুরিত হয়। যার কারণে শিশুমনে সমস্ত যুক্তি, তর্ক, সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা পার করে এক ছায়াস্নিগ্ধ স্থায়ী কল্পনালোক রচনা করে।

"বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস জগতের সিন্ধুতীরে ও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না-কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাব বশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্তের মধ্যেই মুঠা মুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে পরিণত করা যায়- মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষনাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূমি করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে।"[১৫]

ভাঙা-গড়ার এ খেলা শিশু প্রতিদিন নতুন নতুনভাবে শুরু করে। প্রতিদিন নতুন নতুন কল্পনার রাজ্য তৈরি করে শিশু সে রাজ্যের অধিপতি হয়ে বসে। রূপকথা-উপকথার প্রতিটি লাইনের পর যে একটা না বলা 'তারপর' থাকে- এই তারপর কি, তারপর কি, এই তারপরের উত্তর শিশুমন আবিস্কার করতে করতে এগোয়। একটা সময় পর যখন আর এই 'তারপর' কথাটা থাকে না, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় তখন দেখা যায় শিশু একরাশ আনন্দ নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অনাবিল সারল্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রূপকথা-উপকথা যে শুধুমাত্র শিশুমনে কল্পনাশক্তি জাগাতে সাহায্য করে সেরকমটাও নয়। শিশুমনে স্বপ্নরাজ্য গড়ে তোলার পাশাপাশি বড়দের মনেও কল্পনার রাজ্য তৈরি করে। কল্পনার প্রথম পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি হৃদয়রাজ্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় রূপকথা-উপকথা।

“আমরা যাহারা কবি প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা অনেকে অনেক সময় এই রূপকথার নিকট তাঁহাদের কল্পনার উন্মেষ সম্বন্ধে প্রথম সাহায্য লাভ করেন। রূপকথার দিগন্ত-বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া অজ্ঞাতের রাজত্বে প্রথম পদক্ষেপ করিতে শিখেন। সেখানকার মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি তাঁহাদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্বশক্তিকে জাগাইয়া তোলে।”[১৬]

রূপকথা-উপকথার রাজত্বকে বুঝতে হলে আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখা উচিত হবে না। কারণ আধুনিক সাহিত্যের নিয়মনীতি মেনে এগুলি লেখা হয়নি। আসলে রূপকথা-উপকথার ওই মাধুর্যকে বুঝতে হলে, আদিমতার স্বাদ খুঁজে পেতে হলে গল্পগুলিকে জন্মের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলতে হবে।

“বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার নীলাচঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কল্পনা-প্রবণ আশা-আকাঙ্খা-উদ্বেল শিশুহৃদয় এবং ঠাকুমার স্নেহসিক্ত, সরল তরল কণ্ঠস্বর।”[১৭] এরকম পরিবেশ ছাড়া আমরা গল্পগুলির আসল মাধুর্য লাভ করতে পারি না। আমরা খুঁজে পাইনা আমাদের সব পেয়েছির দেশ।

সে যুগের সংকলকরা রূপকথা-উপকথার কাহিনীগুলিকে একত্র করে প্রকাশ করছেন বিশ শতকের প্রথম দিকে, সেটা আমাদের জানাবোঝার মধ্যে আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি ‘বর্ণপরিচয়’ (১৮৫৫) প্রকাশের প্রায় বাহান্ন বছর পর প্রকাশিত হচ্ছে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭)। ১৮৫৫ থেকে ১৯০৭, মাঝখানের এই সময়টিতেও শিশু বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে থেকেছে। সারা উনিশ শতক জুড়ে বিশেষ করে ‘বর্ণপরিচয়’ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রাইমারগুলিতে যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ‘শৈশব’ নির্মাণের কথা বলা আছে, সেটাকেই ঠিকঠাক বলে মনে করেছিলেন সে যুগের শিক্ষিত মানুষজন। ঠিক মনে করেছিলেন বলেই তাঁরা নতুন কিছু ভাবেননি প্রায় অর্ধশতাব্দী। কিন্তু বুঝতে শুরু করেছিলেন এই কঠিন অনুশাসনের মধ্যে শিশু হাঁপিয়ে উঠছে। শিশু স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারছে না। প্রতিমুহূর্তে বাবা-মায়ের আদেশ,

শিক্ষকের উপদেশ, প্রয়োজনে সমাজ থেকে বের করে দেবার হুমকি শিশুর স্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠাকে বিঘ্নিত করছে। শিশু নিজেকে একা মনে করছে। একাকীত্বের বোধ শিশুকে ঘিরে ধরছে। প্রাইমারগুলি থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে শিশুর অবস্থা। এক্ষেত্রে আমরা 'বর্ণপরিচয়'এর ৪পাঠ ও ৫পাঠ থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছি। 'বর্ণপরিচয়'কে গ্রহণ করেছি কারণ বর্ণপরিচয়ের আগে পর্যন্ত প্রকাশিত প্রাইমারগুলির মধ্যে শিশুর শৈশব নিয়ে যা কিছু কথা তার পূর্ণতার সর্বচ্চো ধাপ হিসাবে বর্ণপরিচয়ের আত্মপ্রকাশ। আনুশাসন, আদেশ, উপদেশ যা কিছু নতিস্বীকারের মাধ্যম তার পরিপূর্ণ প্রকাশ আসলে 'বর্ণপরিচয়'। সুবোধ বালক 'গোপাল'এর আদর্শ 'ধরণ' তৈরি করার যে উদ্দেশ্য তার বহিঃপ্রকাশ আসলে 'বর্ণপরিচয়'। তাই আমরা বর্ণপরিচয়কে গ্রহণ করেছি। 'বর্ণপরিচয়'এর দ্বিতীয় ভাগের ৪পাঠ থেকে-

১। কাহাকেও কুবাক্য কহিও না। কুবাক্য কহা বড় দোষ। যে কুবাক্য কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে। লেখা পড়া শিখিলে সকলে তোমাকে ভাল বাসিবে। যে লেখা পড়ায় আলস্য করে কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। তুমি কখন লেখা পড়ায় আলস্য করিও না।

৩। সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কয় সকলে তাহাকে ভাল বাসে। যে মিথ্যা কথা কয় কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা করিবেন তাহা করিবে। কখন তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে তাঁহারা তোমাকে ভাল বাসিবেন না।

৬। পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে বালক চুরি করে তাহাকে চোর বলিয়া সকলে ঘৃণা করে। কেহ বিশ্বাস করে না।

৭। যে ছাত্র প্রত্যহ পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখে সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখ সকলে তোমাকে ভাল বাসিবে। যদি লেখা পড়ায় ঔদাস্য কর কেহ তোমাকে ভাল বাসিবে না।

৮। যে চুরি করে মিথ্যা কথা কয় ঝগড়া করে গালাগালি দেয় মারামারি করে মন দিয়া লেখা পড়া শিখে না সারা দিন খেলিয়া বেড়ায় তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র লোকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক তোমার পিতা মাতা তোমাকে ভাল বাসিবেন না। অন্য কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না। তোমার সহিত কথা কহিবে না। সকলেই তোমাকে ঘৃণা করিবে।

৯। যে বালক পিতা মাতার কথা অগ্রাহ্য করে সে কুপূত্র। পূত্র কুপূত্র হইলে পিতা মাতার বড় অসুখ। তুমি কখন পিতা মাতার কথা অগ্রাহ্য করিও না।

১০। শ্রম না করিলে লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।

১১। যদি মন দিয়া না পড় কিছুই স্মরণ থাকিবে না। আজি যাহা পড়িবে কালি তাহা ভুলিয়া যাইবে। তুমি যখন যাহা পড়িবে মন দিয়া পড়িবে।

১২। যদি কখন কোন দোষ কর জিজ্ঞাসিলে গোপন করিও না। দোষ করিয়া দোষ স্বীকার করিবে এবং সাবধান হইবে যেন আর কখন তোমার দোষ না হয়।[১৮]

উল্লিখিত সবকটা কথাকে আমরা যদি মন দিয়ে দেখি তাহলে দেখবো কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি শিশুর কানের কাছে গিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছে। বাবা মা কি কি কারণে ভালোবাসবে সেই ভালোবাসার কারণগুলি সম্বন্ধে নির্দেশ করছে। সবার প্রিয় হয়ে উঠতে হবে, সবাই-এর

ভালোবাসার লক্ষ্য হতে হবে এটাই একমাত্র। হয়ে উঠতে হবে সর্বগুণসমন্বিত 'ভালো ভদ্র ছেলে'।

একইরকমভাবে 'বর্ণপরিচয়'এর ৫পাঠ যদি দেখি সেখানেও –

১। যে বালক লেখা পড়ায় আলস্য করে সে মূর্খ হয়। মূর্খের চিরকাল দুঃখ। তুমি কদাচ লেখা পড়ায় আলস্য করিও না। তাহা হইলে মূর্খ হইবে ও চিরকাল দুঃখ পাইবে।

২। সুবোধ বালক সর্বদা লেখা পড়ার চর্চ্চা করে। সে কখন মিথ্যা সময় নষ্ট করে না। নির্বোধ বালক লেখা পড়ার চর্চা না করিয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে।

৩। যখন পাঠ অভ্যাস করিতে বসিবে এক বারও অন্য দিকে মন দিবে না। মধ্যে মধ্যে অন্য দিকে মন দিলে অভ্যাস করিতে বিলম্ব হইবে। অধিক দিন মনে থাকিবেক না। পাঠ বলিবার সময় ভাল বলিতে পারিবে না।

৪। যখন যে শব্দ উচ্চারণ করিবে স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে। স্পষ্ট উচ্চারণ না করিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না।

৫। যে কন মন্দ কর্ম না করে তাহাকে সচ্চরিত্র বলে। সচ্চরিত্র বালককে সকলে ভাল বাসে। যে সর্বদা মন্দ কর্ম করে তাহাকে দুশ্চরিত্র বলে। যে বালক দুশ্চরিত্র হয় কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। তুমি কদাচ দুশ্চরিত্র হইও না।

৬। প্রতিদিন যাহা পড়িবে প্রতিদিন তাহা আয়ত্ত করিবে। যত ক্ষণ পড়া আয়ত্ত না হইবে। তত ক্ষণ পড়ায় ক্ষান্ত হইবে না। যদি পড়া আয়ত্ত থাকে জিজ্ঞাসিলে উত্তম বলিতে পারিবে।

৭। পড়িবার সময় গল্প করিও না। গল্প করিলে কিছুই শিখিতে পারিবে না।

৮। যে বালক লেখা পড়া না করিয়া কেবল খেলিয়া বেড়ায় সে বড় লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মীছাড়াকে কেহ ভাল বাসে না। যে দেখে সেই ঘৃণা করে। কেহ তাহার সহিত কথা কয় না। তাহার বাপ মা তাহাকে ভাল বাসেন না।

৯। কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় মন্দ। যে সর্বদা সকলের সঙ্গে কলহ করে তাহার সহিত কাহারও সম্প্রীত থাকে না।

১০। গৃহে দৌরাত্ম্য করিও না। দৌরাত্ম্য করিলে তোমার পিতা মাতা তোমার উপর বিরক্ত হইবেন। তোমাকে কখন ভাল বাসিবেন না।

১১। যে বালক চঞ্চল সে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিতে পারে না। তুমি চঞ্চল হইলে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।

১২। নির্বোধেরা লেখা পড়ায় মন দেয় না। খেলিয়া ও আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করে। এজন্য তাহারা চিরকাল কষ্ট পায়। যাহারা যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া লেখা পড়া শিখে তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।[১৯]

এখানে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে শিশুকে মূর্খ, লক্ষ্মীছাড়া, দুশ্চরিত্র বলা হচ্ছে। যে কাজ বলা হয়েছে সেগুলি না করলে শিশু যে লক্ষ্মীছাড়া তা বলতে দ্বিধাবোধ করা হচ্ছে না। শিশুর শৈশবের স্বাভাবিক বোধগুলি যেমন- চঞ্চলতা, দৌরাত্ম্যকে খারাপ গুণ বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। জোর করে এগুলিকে বন্ধ করে শিশুকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে ক্রমশ তাকে 'যান্ত্রিক' করে তোলার মানসিকতা আমরা দেখেছি প্রাইমারগুলির মধ্যে। আমাদের মনে পড়বে 'তোতাকাহিনী'র সেই পাখিটার কথা। রাজা 'মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন -

"পাখিটাকে শিক্ষা দাও।"[২০]

'পাখিকে খাঁচার মধ্যে আটকে তার শিক্ষা দেবার আনুষ্ঠানিকতা আমরা দেখেছি। উনিশ শতকের 'শৈশব' নির্মাণের প্রত্যাশা অর্থাৎ 'সুবোধ' বালক 'গোপাল' তৈরির যে বাসনা তা আসলে সব শিশুকে খাঁচার পাখিটির মতো করে তুলছে। কিন্তু শিশুর কল্পনা আছে, কৌতূহল আছে, বিস্ময় আছে। বিস্ময়ে অভিভূত হতে চায় সব শিশু।

‘শিশু’কে বাঁচাতে হবে। কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই রূপকথা-উপকথাকে সংকলন করা। সংকলকরা বুঝেছিলেন শিশুর উন্মাদ অবস্থা। তাঁরা আসলে এগুলির মাধ্যমে শিশুর মনের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। শিশুমনের কল্পনা, কৌতূহল, প্রবল উচ্ছ্বাস, বিস্ময়কে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। শিশুকে নিয়মের বেড়াজালে আটকে রেখেও তাকে বিস্মিত হওয়ার পরিসর দিতে হবে। শিশুকে গল্প শোনাতে হবে। আসলে প্রাইমারগুলিতে এই গল্পের অভাব পূরণ করছে রূপকথা-উপকথা।

রূপকথা-উপকথার মৌলিক আবেদন একমাত্র শিশুমনের সারল্য ও বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহলের উপরেই। ‘গল্প বলো’ এ দাবি শিশুর অন্যতম প্রধান দাবি। এই দাবির কারনেই তৈরি হয়েছে হাজার হাজার গল্প। রাজা-রানির গল্প, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প। যতই তাকে কঠোর অনুশাসনের মধ্যে ফেলার চেষ্টা করা হোক না কেন, গল্প তাকে শোনাতেই হয়। শিশু, সে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে থাকা পরিবারের হোক বা চাষির ঘরের, রাজপুত্র রাজকন্যা হতে চায় সবাই। কল্পনায় রাজকন্যা-রাজপুত্র হতে তো কোনো বাধা নেই। একদিন সে হতে পারে ‘বুদ্ধু-ভুতুম’ অন্যদিন ‘লালকমল-নীলকমল’। আবার একদিন সে যদি হয় ‘কাঞ্চনমালা’ তো পরের দিন ‘পুষ্পমালা’। বুদ্ধু-ভুতুম-লালকমল-নীলকমল-কাঞ্চনমালা-পুষ্পমালা সব চরিত্রগুলিই আগাগোড়া বানানো, হয়তো তাদের মতো হয়ে ওঠা কোনোকালেই সম্ভব না কিন্তু কল্পনায় কেউ যদি হতে চায়, তার জন্য কোনো বকাবকি নেই। আসলে এই চরিত্রগুলির এগিয়ে যাওয়া, অভিযানের সাক্ষী থাকতে চায় শিশুমন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নিজেদের কে নিয়ে পাড়ি দিতে চায় রাজকন্যা উদ্ধারের দুঃসাহসিক অভিযানে।

নীতিবাক্যের সূচকগুলিকে পেরিয়ে ‘গোপাল’এর শৈশব নির্মাণকে আরও বেশি আকর্ষক করে তুলছে রূপকথা-উপকথা। শিশুকে নিয়মের বশবর্তী করেও নতুন রাজ্যের সন্ধান দিচ্ছে

রূপকথা-উপকথা। 'শৈশব'কে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গড়ে তুলছে এই সংকলনগুলি। সর্বোপরি 'গোপাল'কে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে গল্প বলা ঠাকুরমার কাছে।

আর একটা বিষয়ের অবতারণা করে আমরা এ অধ্যায়ের শেষ করব। রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলি একত্র করার প্রয়োজন কেন পড়ল, কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এগুলিকে লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছিল তা আমরা জেনেছি। শিশুর শৈশব নির্মাণে এই সংকলনগুলির ভূমিকা কি তাও আমরা জেনেছি। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো যে আদৌ এই সংকলনগুলির মধ্যে সমাজের কোনো ছবি ফুটে উঠেছে কিনা। সমাজ সম্পর্কিত বোধ সত্যিই কি প্রকাশিত হয়েছে?

রূপকথা-উপকথার গল্পগুলিতে অলীক কল্পনা, অবাস্তব কাহিনী, অলৌকিক ঘটনার প্রাধান্য- এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে, আধুনিকতার আদর্শ রূপের সাথে মেলানো যায় না বলে, এই সংকলনগুলিকে প্রথমেই বাতিল করে দিয়েছেন অনেকেই। শিশুকে আকাশ-পাতাল অবাস্তব কল্পনা করিয়ে তাকে অসম্ভবের রাজত্বের বাসিন্দা করে লাভজনক কিছু মিলবে বলে আশা করেন না অনেকে। কিন্তু আমরা দেখেছি এই গল্পসংকলনগুলির অবাস্তব কাহিনী শিশুর কাছে কতটা মনোগ্রাহী। লাভজনক কিছু না মিলুক, ক্ষতির সম্ভাবনা যে নেই তা বেশ বোঝা গেছিল। রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলিকে আমরা যদি একটু খুঁটিয়ে দেখি তাহলে দেখব এর মধ্যেও ধরা আছে সমাজের নিখুঁত ছবি। গল্প বলার মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার কাঠামোকে, পারিবারিক সমস্যার বিভিন্ন দিক, তা থেকে উত্তরনের উপায়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে রূপকথা-উপকথার গল্পগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার আবরণে নিজেকে ঢেকে সব কিছুকে গোপন রাখার চেষ্টা করে। এই আবরণটা সরিয়ে নিলে সমাজের কঠোর বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে ধরা দেবে। এ সমাজব্যবস্থা যে আদ্যোপান্ত 'পিতৃতান্ত্রিক' তা বোঝা যায় গল্পগুলিতে পুরুষের আধিপত্য ও মেয়েদের অবস্থা দেখে। আমরা

দেখেছি অনেক গল্পই শুরু হয়েছে নিঃসন্তান রাজার মনোবেদনা দিয়ে। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, দেশের-দশের কাছে কন্যার চেয়ে পুত্রের অভাব অনেক বেশি শোচনীয়। পুত্র চাই কারণ পুত্র না থাকলে বংশ লোপ পাবে। ছিন্ন হবে ধারাবাহিকতা। পিতা থেকে পুত্র, এই ক্রমে ছেদ পড়লে সামাজিক শৃঙ্খলার ভিতটাই ধসে যায়। আলগা হয় সামাজিক বাঁধন। পিতার পর পুত্র এই ক্রমে জন্ম নেয় 'ক্ষমতা'। এবং ক্ষমতা বস্তুটি আসলে পিতৃতান্ত্রিক। পিতৃতান্ত্রিকতার প্রধান আশ্রয় পরিবার; প্রায় সব গল্পে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রসার আসলে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিপত্তিবৃদ্ধি। পরিবার রাষ্ট্রের হাতকে শক্ত করে, তাই রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখতে চায় পরিবার নামক ধারণাটিকে। রূপকথা-উপকথার গল্পগুলিতে এই যে পরিবারের কথা, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার কথা আছে তা আসলে কি আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পিত প্রজেক্ট নয়? সমাজের মূল ভিতটাই তো বলে দেওয়া আছে এখানে। উপরিকাঠামোতে, বাস্তব জীবনে আমরা যে সুখের সন্ধান করে থাকি, সেই সুখের সন্ধানই প্রতিটি গল্পের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। এই যে সুখের সন্ধান, সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ, পারিবারিক কলহ, পাপ-পূর্ণের জয়-পরাজয়, দুঃসাহসিক অভিযান, কঠিন পরিস্থিতি থেকে বাঁচার চেষ্টার কথা সব গল্পেই মোটামুটি বলা আছে তা আসলে আমাদের বাস্তব জীবনের কথা। এই যে প্রতিটি গল্পে রাক্ষস-রাক্ষসীরা রাজকুমারকে পথে বাঁধা দেয়-এ বাঁধা আসলে বাস্তব জীবনে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হই, সেগুলিই। প্রতিটি গল্পে রানিদের মধ্যে কলহ তা আসলে আমাদের পারিবারিক কলহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নিঃসন্তান রাজার কাহিনী যে অনেক গল্পের শুরু তা আসলে বাস্তবে একজন বাবার করুণ আর্তি। একটা সুখের বাতাবরণ তৈরি করে যে প্রতিটি গল্পের শেষ তা বাস্তবে আমাদের চাহিদা, সুখে থাকার বাসনা, সুখে থাকতে চাওয়া তা প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সমাজকে অস্বীকার করা হয়নি এই রূপকথা-উপকথার গল্পগুলিতে। সমাজের মূল কাঠামোটিকে বজায় রাখার পাশাপাশি শিশুর কাছে সমানভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠছে উল্লিখিত

গল্পসংকলনগুলি। কার্যত শিশুর শৈশবের নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে রূপকথা-উপকথার সংকলন।

উল্লেখপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া', *লোকসাহিত্য,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৭

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রাম্যসাহিত্য', *লোকসাহিত্য,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৯২

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি,* দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ৯

৪। তদেব, পৃ. ১০

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া:২', *লোকসাহিত্য,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৪৯

৬। তদেব, পৃ. ৫০

৭। তদেব, পৃ. ৪৯

৮। তদেব, পৃ. ৪৯

৯। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'শিশুশিক্ষা', প্রথম ভাগ, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ,* আশিস খাস্তগীর(সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২০৬

১০। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, 'শিশুশিক্ষা', তৃতীয় ভাগ, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ,* আশিস খাস্তগীর(সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২২৮

১১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপকথা', *একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), ১৯৯২, পৃ. ৪৬

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া', *লোকসাহিত্য*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ১২

১৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপকথা', *একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), ১৯৯২, পৃ. ৪৫

১৪। পবিত্র সরকার, 'বর্ণপরিচয়' থেকে 'কিশলয়' : বিতর্কের নানা দিক', *ভাষা দেশ কাল*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., অগ্রাহায়ণ ১৪২২, পৃ. ১১০-১১১

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া', *লোকসাহিত্য*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ১২

১৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপকথা', *একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), ১৯৯২, পৃ. ৪৯

১৭। তদেব, পৃ. ৪৫

১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বর্ণপরিচয়', দ্বিতীয় ভাগ, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ*, আশিস খাস্তগীর(সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৩০০-৩০৩

১৯। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'বর্ণপরিচয়', দ্বিতীয় ভাগ, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ*, আশিস খাস্তগীর(সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৩০৫-৩০৭

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তোতাকাহিনী', লিপিকা, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ২৬ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৭০, পৃ. ১৩২

তৃতীয় অধ্যায়

রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলির সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিচার

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে রূপকথা-উপকথার সংকলনের গল্পগুলি কি ভূমিকা পালন করে। শৈশব নির্মাণের যে প্রকল্প তাকে সার্বিকভাবে সুসম্পূর্ণ করার জন্য রূপকথা-উপকথার গুরুত্ব কতটা তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। কোন সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই মৌখিক সাহিত্যগুলিকে সংকলন করা হয়েছিল তাও আমরা বলার চেষ্টা করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় "নির্বাচিত রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলির সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিচার"। অর্থাৎ আমরা এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করবো রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলির অন্তর্গত গল্পগুলির চরিত্রদের ভাষা ব্যবহার। চরিত্রগুলির ভাষা ব্যবহার একে-অপরকে আলাদা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে ফেলছে কিনা? বিভিন্ন চরিত্রের ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য ধরা পড়ছে কিনা? ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতার কারণে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে? আমরা খোঁজার চেষ্টা করবো চরিত্রদের মনোভাব। সর্বোপরি আমরা খোঁজার চেষ্টা করবো এত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অবতারণা কেন? কার্যত আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো চরিত্রদের বলা কথাগুলি শিশুর কাছে আলাদা কোনো মাত্রা বহন করে আনছে কিনা? আনলে তার প্রভাব শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে কতটা? রাজনৈতিক কোনো গুঢ় কারণ আছে কিনা তাও আমাদের অন্বেষণের মধ্যে থাকবে।

এটা সকলের জানাবোঝার মধ্যে আছে রূপকথা-উপকথার সংকলন শৈশব নির্মাণ করে। আসলে সংকলনগুলির গল্পগুলি শৈশব নির্মাণ করছে। গল্পগুলির ভাষা শৈশব নির্মাণ করছে। বইগুলির উল্লিখিত ভাষা কার্যত শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে আসল ভূমিকা গ্রহণ করে। উপরে উল্লিখিত যে প্রশ্নগুলি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটু জেনে নেবার চেষ্টা করব ভাষা কি? ভাষার কাজ কি? সমাজে ভাষার ভূমিকা কি? জানার চেষ্টা করব ভাষার সমাজনিয়ন্ত্রক ভূমিকা। যেহেতু ভাষা শৈশব নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, তাই ভাষা সম্বন্ধিত আলোচনা প্রথমেই করে নেওয়া প্রয়োজন।

ভাষা নিয়ে কথা বলতে গেলে ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন। সমাজে ভাষার প্রভাব বুঝতে গেলে সমাজ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা দরকার। ভাষা কি, ভাষার কাজ কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই প্রশ্ন তৈরি হয় যে ভাষা তৈরি হল কেন? এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে একটু অতীতের দিকে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে কার্ল মার্কসের কাছে। শুরুতেই বলে দেওয়া প্রয়োজন কার্ল মার্কস থেকে শুরু করে বিভিন্ন মার্কসীয় ভাষাতাত্ত্বিক যেমন এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন – এঁরা কেউই ভাষাবিজ্ঞানী নন। এঁদের কেউই ভাষার রূপ অর্থাৎ ফর্ম বা স্টাকচার নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এঁরা মূলত সমাজ সংগঠনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষা সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ত্ব দিয়েছেন। এঁদের আলোচনার মূল বিষয়গুলি ছিল ভাষার উদ্ভব, বিবর্তন, সমাজ গঠনে ও সমাজ সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা, সমাজ পরিবর্তনে ভাষার ব্যবহার, শ্রেণির সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক, বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক। এঁরা মূলত ভাষাকে চিন্তাজ্ঞাপন 'কমিউনিকেশন', প্রকাশ 'এক্সপ্রেশন' এবং প্রবর্তন বা 'পারসুয়েশন' এর একটি বাহন হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এঁরা ভাষা কে দেখাতে চেয়েছেন মানব সমাজের একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবে[১]।

ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে হার্ডার বলেছেন –

'ভাষার সৃষ্টি করেছে মানুষ, ঈশ্বর নয়'[২]।

কথাটাকে প্রমাণিত সত্য বলে যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে বলা যায় কোনো একজন ব্যক্তিমানুষের দ্বারা ভাষা তৈরি হয়নি। ভাষা তৈরি হওয়ার জন্য একাধিক মানুষের দরকার হবে। একাধিক মানুষ যখন অবস্থান করছে তাহলে ধরে নিতে হবে 'সমাজ' নামক একটা ধারণারও অস্তিত্ব আছে। সমাজ না থাকলে, মানুষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ তৈরি না হলে ভাষার জন্ম হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রশ্ন তৈরি হয় সমাজ তৈরি হয় কিসের ভিত্তিতে?

আসলে সমাজ তৈরি হয় কাজের ভিত্তিতে। কাজের সূত্র ধরেই মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ গড়ে ওঠে। মার্কস ও এঙ্গেলস এই বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন এইভাবে –

"Language, like consciousness, only arises from the need, the necessity of intercourse with other man"[৩] .

মানুষ ছাড়াও আরও অনেক পশুপাখি দলবদ্ধভাবে থাকে। কিন্তু তাদের এই দলবদ্ধতা 'সমাজ' নয়, এবং তাদের মুখ ও গলার ইন্দ্রিয়গুলিও ভাষা সৃষ্টির সহায়ক নয়। তাদের সমাজ না থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হল সংগঠিত শ্রমের দ্বারা তারা কখনও আবদ্ধ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেছেন –

"প্রথমে শ্রম, তারপরে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা- বানর জাতীয়ের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হওয়ার পিছনে এ দুটিই হল সবচেয়ে অপরিহার্য প্রেরণা!"[৪]

Ernst Fischer এঙ্গেলস-এর কথাটিকে একটু অন্যভাবে বলেছেন। 'শ্রম' কথাটির বদলে তিনি 'কাজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ কথা পবিত্র সরকার জানাচ্ছেন। তিনি বলছেন –

"Only in work and through work do living beings have much to say to one another. Language come into being together with tools"[৫]

ভাষাবিজ্ঞানী ফিশার ভাষার আদি উদ্ভবের পটভূমি হিসাবে যা বলছেন তা আমাদেরকে জানাচ্ছেন পবিত্র সরকার মহাশয়। ফিশার বলেছেন –

"Without work- without his experience of using tools- man could have never developed language as an imitation of nature and as a system of signs to represent activities and objects..."[৬]

অর্থাৎ শুধু বস্তুজীবন নয়, শ্রম ও কাজের সূত্রে, উৎপাদনের হাতিয়ার ব্যবহারের সূত্রে সংঘবদ্ধ সমাজজীবনই ভাষার আদি উদ্ভবের পটভূমি।

ভাষা একটি বাহন বা মিডিয়াম। মানুষের নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এক্ষেত্রে পবিত্র সরকার লেনিন কে উদ্ধৃত করছেন –

"Language is the most important means of human intercourse"[৭]

– সেই সঙ্গে ভাষা একটি অস্ত্রও বটে। সংগ্রামের অস্ত্র। সমাজকে এক ধাপ থেকে পরের ধাপে এগিয়ে দেওয়ার অস্ত্র।

ভাষার উদ্ভব নিয়ে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের মত আমরা জানলাম। এখন আমরা জানার চেষ্টা করব ভাষা কি। ভাষার কাজ কি। ভাষা কিভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার সমাজনিয়ন্ত্রক ভূমিকা জেনে নেওয়ার পর আমরা আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব।

ভাষা, যা আসলে মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাষা আসলে উচ্চারিত ধ্বনি(Sound)। ভাষা বলতে ডঃ উদয়কুমার চক্রবর্তী বলেছেন –

"মানুষের কণ্ঠোচ্চারিত, চিন্তাবহ, অসংখ্য ভাব প্রকাশক, বিবর্তনধর্মী ও সঞ্জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থযুক্ত ধ্বনির গঠন হল- ভাষা(language)।"[৮]

ভাষা বলতে Leonard bloomfield বলছেন –

"The totality of utterances that can be made in a speech community is the language of that speech community"[৯].

অর্থাৎ কোনো ভাষাগোষ্ঠীতে যা যা উচ্চারণ সম্ভব তার সমগ্রটা মিলিয়েই সেই ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা নির্মিত হয়। এখানে ভাষাগোষ্ঠী বলতে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের সব মানুষের কথা বলা হয়েছে। ভাষাগোষ্ঠী আলাদা হলেই ভাষাও আলাদা হবে। ভাষাগোষ্ঠী আলাদা হলেই, ভাষার শর্ত হিসাবে যে 'পারস্পরিক বোধগম্যতার' কথা বলা হয় সেই শর্ত ধাক্কা খায়। কারণ একের ভাষা অপরের থেকে তখন আলাদা হয়ে যায়।

Peter Trudgill আবার ভাষাকে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন। ভাষার কথা বলতে গিয়ে তিনি 'শব্দ'কে আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন –

"The fact is that none of us can unilaterally decide what a word means. Meanings of words are shared between people- they are a kind of social contract we all agree to- otherwise communication would not be possible"[১০].

অর্থাৎ কেউ এককভাবে ঠিক করতে পারবে না একটা শব্দের কি অর্থ। শব্দের অর্থ আসলে মানুষ ভাগ করে করে বোঝে – শব্দ আসলে মানুষের সবার স্বীকৃত সামাজিক সংযোগের এক মাধ্যম – নইলে যোগাযোগ সম্ভবই হত না।

এখন যদি প্রশ্ন হয় ভাষার কাজ কি, তাহলে উত্তরে বলা যায় ভাষার কাজ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। ভাষা একদিক দিয়ে যেমন তার মানসকে প্রকাশ করে চলেছে, তেমনি প্রতিমুহূর্তে করে চলেছে সংযোগসাধন। আসলে ভাষার কাজ সংজ্ঞাপন করা। সংজ্ঞাপন করার মাধ্যমেই ভাষা সমাজে তার জায়গাকে পাকা করে। আমাদের সবার জানাবোঝার মধ্যে আছে যে মানুষের চিন্তার মুখ্য উপাদান হলো ভাষা। মানুষের যা কিছু চিন্তা করতে হয় তা ভাষার মাধ্যমেই। বস্তুত ভাষা ব্যতিরেকে একজন মানুষ পৃথিবীতে গঠিতই হতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রতিমুহূর্তে যা কিছু করতে হয় – তার ভাবনার গঠন – তৈরি হয় ভাষাকে ভর করেই। তাই বলা যেতে পারে –

"ভাষা হল চিন্তার অব্যবহিত বস্তুগত রূপ –'the immediate reality of thought' – এবং তা আসলে ব্যবহারিক ও বাস্তবায়িত চেতনা – 'Practical,...actual consciousness"[১১].

চিন্তা বা চেতনা দ্বারাই আসলে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিন্তা চেতনাকে ভাগ করে ফেললেই বোঝা যাবে কোন চিন্তার দ্বারা সমাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যেমন ধরা যাক পৃথিবীতে কমবেশি মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। আবার এমন মানুষও পাওয়া

যাবে যারা ঈশ্বরে বা দৈব শক্তিতে বিশ্বাস করেন না। এখন এই দুই বিপরীত চিন্তার মানুষ যদি সমভাষাভুক্ত হন তাঁদের ভাষা ব্যবহারে সূক্ষত শব্দ প্রয়োগে তাঁদের ধর্মচেতনা বা বিশ্বাস প্রসঙ্গে ধারণা সম্ভব। এমনকি তাঁদের ভাষা ব্যবহার – শব্দ প্রয়োগ তাঁদের ধর্মচিহ্ন সম্পর্কেও শ্রোতাকে ধারণা দেবে। যেমন – ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ তাঁদের ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহারে পরস্পর পরস্পরের থেকে পৃথক। উদাহরণ হিসাবে আমরা সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পের দুটি চরিত্রকে নেব। যেখানে দেশলাই দিয়ে বিড়ি ধরানোর প্রেক্ষিতে মাঝি চরিত্রের 'সোহান আল্লা' – বলায় সুতা মজুর চরিত্র প্রথমেই বুঝে যায় মাঝি মুসলমান। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি বাংলা সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পে গল্পকার একজন চরিত্রের সামাজিক-ধর্মীয় পরিচিতি স্পষ্টত চেনাচ্ছেন সরাসরি ভাষাকে মার্ক করে। এরকমভাবে বিভিন্ন চিহ্ন – লিঙ্গ, বয়স, পেশা, অর্থনৈতিক অবস্থান ইত্যাদি সমস্ত কিছুর সাহায্যে একজন ভাষীকে নির্ণয় করা যেতে পারে। অথবা বলা যায় একজন ভাষীকে দ্বিতীয় জন থেকে পৃথক করা যেতে পারে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলির দ্বারা সমাজ মূলত পরিচালিত হয় তা প্রকাশের ভাষাই হচ্ছে সমাজভাষীকে নির্ণয়ের চিহ্ন। আবার মূল্যবোধ বা বিশ্বাস একইরকম হওয়ার পরেও ভাষার নানা বিভাগ থাকে। যার ভিত্তিতে উপভাষা কথাটির জন্ম। এবং সাথে সাথে আমরা ভাষার মান্যায়ন কথাটিকেও জেনে থাকি। ধরা যাক পুরুলিয়ার কোন গ্রামের স্কুলে একজন ছাত্র তার শিক্ষক সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাবোধ রাখে, কলকাতার স্কুলে বসা সমবয়সী ছাত্র একই শ্রদ্ধাবোধ শিক্ষক সম্পর্কে রাখতে পারে; কিন্তু দুই ছাত্রের ভাষার প্রভূত তফাৎ থাকবে। এবং কলকাতা রাজধানী শহর ও ক্ষমতায়নের কেন্দ্র হওয়ায় কলকাতার ছাত্রের ভাষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং মান্যতা পায়। ছাত্র-শিক্ষক কথোপকথন যদি কোন ছাপা লেখাতে দেখা যায় তাহলে তার আদর্শবোধ দেখবো কলকাতার ভাষাতেই। এটাই হল ভাষার ক্ষমতায়ন।

রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত ভাষা। আরও বলা যেতে পারে স্কুল শিক্ষার সরকারী বইয়ের ভাষা কলকাতা-পুরুলিয়া-চব্বিশ পরগনা সব জায়গাতেই এক। সুতরাং কেন্দ্র একটা নির্দিষ্ট ভাষাকে প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে লিপ্ত। এবং সামাজিক মান্যায়ন ভাষার ওপর নির্ভর করে তৈরি হয়ে আছে আমাদের সমাজব্যবস্থায়।

প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে আসা কোন মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা হয় তার ভাষা দিয়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই দেখা যাবে প্রান্ত থেকে কেন্দ্রের শিক্ষাক্ষেত্রে আসা কোন ছাত্র ধীরে ধীরে কেন্দ্রের ভাষা আত্তীকরণ করে নিজের মধ্যে। আর এরকমভাবে ভাষা ক্ষমতার একটি চিহ্ন হয়ে ওঠে।

"ভাষার মাধ্যমে শক্তি বা ক্ষমতা প্রদর্শনও চলতে থাকে। তা রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা নেয়"[১২]।

যদিও একথা মনে রাখতে দরকার যে ভাষা কিন্তু সমাজব্যবস্থার বেস-এর ওপর তৈরি উপরিকাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার নয়। সুপারস্ট্রাকচার হচ্ছে – রাজনৈতিক, নীতিগত, ধর্মীয়, নন্দনতত্ত্বগত কিংবা দার্শনিক অবস্থানসমূহ। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব বেস অনুযায়ী সুপারস্ট্রাকচার তৈরি হয় আসলে। যেমন দাস সমাজব্যবস্থায় দাসেরাই এবং দাসপ্রথার যে অর্থনীতি –তা হল সমাজের বেস এবং সে সমাজের সামাজিক রীতিনীতি সমসাময়িক ভিত্তি অনুযায়ী – তা হল সুপারস্ট্রাকচারের অংশ।

আবার খেয়াল রাখতে হবে যে বাংলা গদ্যের জন্মের একশ বছর পরে একই উপনিবেশের কালে একই সামাজিক বেস-এ ভাষার আমূল বদল ঘটেছে। ভাষার বদল বেস-এর বদলে ঘটে ঠিকই কিন্তু তা একমাত্র নয়। বরং ভাষা সুপারস্ট্রাকচারকে প্রকাশের চিহ্নমাত্র।

বাংলা ভাষায় মধ্যমপুরুষে তিনটি ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে সামাজিক মর্যাদার নির্ণয় অনেকাংশে করা যেতে পারে। যার থেকে বোঝা যেতে পারে ভাষা বেস বা সুপারস্ট্রাকচারের চিহ্নায়ক মাত্র। ভাষা নিজে বেস বা সুপারস্ট্রাকচার কিছুই নয়। যেমন - একজন সবজি বিক্রেতাকে সহজেই

উচ্চপেশার মানুষ তুমি বা তুই সম্বোধন করতে পারে; কিন্তু সবজি বিক্রেতা ক্রেতা উচ্চপেশার মানুষকে তুই বা তুমি সম্বোধন করবে না; করবে আপনি সম্বোধন। আবার ঐ উচ্চপেশার মানুষটি ব্যাঙ্কের একজন কর্মীকে আপনি সম্বোধন করেই কথা বলবে।

আসলে বেস হচ্ছে সমাজের অর্থনীতি। কিন্তু এখানে 'তুমি' বা 'আপনি' বা 'তুই' সুপারস্ট্রাকচার নয়। সুপারস্ট্রাকচার হল সম্বোধনগুলির পিছনের নীতিবোধ বা মনোভাবগুলি। ইংরেজি ভাষায় 2nd person-এর এরকম বহু শব্দ নেই, কেবল 'you' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেখানেও নীতিবোধগুলি বদলায় না।

উপরের উল্লিখিত আলোচনায় আমরা ভাষা কি, ভাষার কাজ কি, ভাষা কিভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বলার চেষ্টা করেছি। কিভাবে একটা ভাষা ক্রমে মান্য হয়ে ওঠে তাও বলার চেষ্টা করেছি আমরা। এখন আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো ভাষার বিভিন্ন বিভাগগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা বিভাগ 'সমাজ-উপভাষা' সম্বন্ধে।

সমাজ-উপভাষা অর্থাৎ sociolect কথাটি ব্যবহৃত হয় সামাজিক বুলি বা উপভাষা অর্থে। ভাষার কোনো বুলি যা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি ব্যবহার করে থাকে তাকে সমাজ-উপভাষা বলা হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির ভাষিক বৈশিষ্ট্যের যে সমাহার তাকে সমাজ-উপভাষা বলা হয়। সমাজ-উপভাষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী peter trudgill বলেছেন-

"A variety of lect which is thought of as being related to its speakers social background rather then geographical background"[১৩].

সামাজিক শ্রেণির ভাষিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমেই এক সমাজ-উপভাষা থেকে অন্য সমাজ-উপভাষা আলাদা হয়ে যায়। সাধারণত এক সমাজ-উপভাষার ভাষীরা একই আর্থ-সামাজিক শ্রেণির (socio- economic class) হয়ে থাকে অথবা তাদের শিক্ষার মান বা যোগ্যতা এক।

ট্রাডগিল এও বলেন যে – কোনো সামাজিক শ্রেণী হল এমন একটি প্রধান গোষ্ঠী যাদের সভ্যদের সকলেরই প্রায় একই অর্থনীতিতে অবস্থান।

মর্যাদা অনুসারে সমাজ-উপভাষা বিষয়গতভাবে উচ্চ, নিম্ন এভাবে ভাগ করা হয়। যেমন ব্রিটেনের সবচেয়ে উচ্চ সমাজ-উপভাষা হল 'গৃহীত উচ্চারণ' (Received pronunciation)। গৃহীত উচ্চারণের ব্যবহারকারীরা সমাজের উচ্চস্থরের লোক, তাদের সামাজিক মর্যাদা আছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে। ব্রিটেনের গৃহীত উচ্চারণ যেহেতু উচ্চতম সমাজ-উপভাষা ফলে তা মান্য Accent হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত।

সমাজ-উপভাষা নিয়ে যা কিছু চর্চা বা গবেষণা তা আগে ছিল পুরোটাই গ্রামকে ভিত্তি করেই। আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে সেই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমে শহরেও এই উপভাষা চর্চার প্রবণতা দেখা গেছে। আমরা জানি শহরের মানুষ সাধারণত মান্য ভাষায় কথা বলে। যারা গ্রামে বাস করে, যাদের বসবাসের একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান আছে মান্য ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার পার্থক্য থাকবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু শহরের ভাষাচর্চায় দেখা গেল আঞ্চলিকতাভেদ ছাড়াও, সমাজের বিভিন্ন স্থরের মানুষের মধ্যে ভাষার ভেদ দেখা যাচ্ছে। এই যে ভাষার ভেদ দেখা যাচ্ছে তা মূলত নির্ভর করছে সেইসব মানুষের সামাজিক মর্যাদা অথবা তাদের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্যের কারণে। অর্থাৎ শহরে যেমন সামাজিক শ্রেণি আছে তেমনই সেই শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত ভাষা ব্যবহারও আছে। এই যে শ্রেণিগত ভাষা ব্যবহারে মিল এবং এত মিল ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে বুলিগত চরিত্র তৈরি হয় তাকে সমাজ-উপভাষা বলে।

সমাজ-উপভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে উপভাষার প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। উপভাষা মূলত অঞ্চলভেদে লক্ষ্য করা যায়। উপভাষা হল একটি বুলি যা অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ। উপভাষার কোনো স্বাতন্ত্রতা নেই; তা মান্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত ও পরতন্ত্র এবং উপভাষা যেহেতু একটি

নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই চলমান নয়। অন্যদিকে সমাজ-উপভাষার সাথে সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষা, চলমানতার সম্পর্ক রয়েছে এবং তা সমাজ-উপভাষা নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সমাজ-উপভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাই ভাষিক গোষ্ঠী যখন যেখানে যাবে তখন সে তার সমাজ-উপভাষা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। তাই বলা যায় সমাজ-উপভাষা ভুলিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হলেও শেষপর্যন্ত ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। এখন আমরা উপভাষার সাথে সমাজ-উপভাষার যে পার্থক্য তা একটা ছবির মাধ্যমে দেখাবো।

উপভাষা -

+ বুলি

± অঞ্চল

– স্বতন্ত্রতা

– চলমানতা

সমাজোপভাষা -

+ বুলি

– অঞ্চল

– স্বতন্ত্রতা

± মর্যাদা

± শিক্ষা

+ চলমানতা

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ-উপভাষার মধ্যে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে মর্যাদা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় যুক্ত হচ্ছে। আমাদের সবার জানাবোঝার মধ্যে আছে যে আধুনিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। সমাজে মানুষ বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পার্থক্য থাকে তাই সমাজে বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্বও বর্তমান। এই সামাজিক স্তরবিন্যাস ভাষাতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। আমরা জেনেছি অর্থ উপার্জন অর্থাৎ অর্থের উৎস সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে পড়ে। কোথায় থাকে, কীরকম বাড়িতে থাকে তাও একধরণের নির্ধারক। আমরা আমাদের আলোচনায় বলতে চেয়েছি যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে ভাষার ভেদ হয়।[১৪] এখন আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব এই সামাজিক স্তরবিন্যাসটা সমাজভাষাতাত্ত্বিকরা কিভাবে দেখিয়েছেন।

লেবোভ তিনটি মানদণ্ড নিয়েছিলেন সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে। তিনটি মানদণ্ড থেকে তিনি দশ রকমের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর নির্ণয় করেছিলেন। এই দশটি স্তরকে ০-৯ সংখ্যার দ্বারা নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর ০(শূন্য) হচ্ছে নিম্নতম শ্রেণি – এদের সামান্য শিক্ষা আছে অথবা নেই। ১-৫ নম্বর শ্রেণি হল শ্রমিক শ্রেণি। এরা মূলত উচ্চবিদ্যালয়ে পড়েছে, উপার্জন মোটামুটি ভালোই। ৬-৮ নম্বর শ্রেণি হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। শিক্ষাগতভাবে এরা স্নাতক পর্যায়ের। উপার্জনও বেশ ভালো, সন্তানদের কলেজে পাঠানোর সামর্থ্য আছে এদের। তাঁর আলোচনায় ৯ নম্বর শ্রেণি হল উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এরা সাধারণত উচ্চশিক্ষিত, পেশাগতভাবে উচ্চশ্রেণির অথবা ব্যবসায়ী। লেবোভ তিনটি মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে চারটি সামাজিক শ্রেণির কথা বলছেন – ১) নিম্নতম শ্রেণি ২) শ্রমিক শ্রেণি ৩) নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ৪) উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

ট্রাডগিল সামাজিক শ্রেণির বিন্যাস করেছেন আরও একটু বিস্তারিতভাবে। তিনি যে শ্রেণিগুলির কথা বলেছেন সেগুলো হল – ১) মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি ২) নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ৩) উচ্চ শ্রমিক

শ্রেণি ৪) মধ্য শ্রমিক শ্রেণি ৫) নিম্ন শ্রমিক শ্রেণি। তিনি এই সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের করার জন্য ছয়টি মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করেছেন। সেগুলো হল পেশা, আয়, শিক্ষা, আবাস, এলাকা ও পিতার আয়।

শুই(shuy) এবং অন্যান্যরা সামাজিক শ্রেণি নির্ণয় করতে গিয়ে মানদণ্ড হিসাবে শিক্ষার পরিমাণ, পেশা ও বাসস্থান কে নিয়েছেন। এঁরা চারটি সামাজিক শ্রেণির কথা বলেছেন। সেগুলো হল – ১) উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি ২) নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি ৩) উচ্চ শ্রমিক শ্রেণি ৪) নিম্ন শ্রমিক শ্রেণি।[১৫]

উপরের আলোচনা থেকে এটা বলা যেতে পারে এই যে সামাজিক স্তরবিন্যাস, এর কারণে ভাষার বদল ঘটে। একজন উচ্চশিক্ষিত যেরকম ভাবে কথা বলবে, একজন কম শিক্ষিত বা পড়াশুনা না জানা মানুষ তেমনভাবে কথা বলবে না। ভাষার হেরফের হবে তাদের মধ্যে। আমরা দেখেছি সামাজিক শ্রেণির ভিত্তিতে যেমন ভাষার ভেদ হয় তেমনভাবে জাতের কারণে, ধর্মীয় কারণেও ভাষার ভেদ লক্ষিত হয়। এছাড়াও বয়সের পার্থক্যের জন্য, লিঙ্গের পার্থক্যের জন্য, নারী-পুরুষ ভেদের কারণেও ভাষার পার্থক্য দেখা যায়। আমরা আমাদের আলোচনায় সামাজিক শ্রেণির কারণে ভাষার যে পার্থক্য অর্থাৎ রূপকথা-উপকথায় যে এত এত সমাজ-উপভাষার ব্যবহার কেন তা বলার চেষ্টা করব।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কারণে মানুষের ভাষার পরিবর্তন হয়ে থাকে। আমরা আমাদের আলোচনায় সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসটা খোঁজার চেষ্টা করব। এই সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের কারণে ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তাও খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের আলোচনায় দুই শতকের যে তিনটি text কে গ্রহণ করেছি সেগুলো হল ‘বাংলার উপকথা’ (১৮৮৩), ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’ (১৯০৭), ও ‘রাঙাদির রূপকথা’ (১৯৭০)। এই তিনটি text-এর মধ্যে ‘বাংলার উপকথা’তে আছে মোট বাইশ(২২)টি গল্প। ‘ঠাকুরমা’র

ঝুলি'তে আছে চোদ্দ (১৪)টি গল্প এবং 'রাঙাদির রূপকথা'তে আছে পাঁচ(৫)টি গল্প। 'বাংলার উপকথা' নামক সংকলনের মোট বাইশ টি গল্পের চরিত্রের যে সমাহার দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'গোপন প্রাণ' নামক গল্পে দশটি চরিত্র আছে যারা কথা বলছে। একইরকমভাবে সব গল্পগুলিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব 'ফকিরচাঁদ' গল্পে এগারোটি চরিত্র। 'গরিব ব্রাহ্মণের কথা' গল্পে ছয়টি চরিত্র। 'রাক্ষসের গল্প' গল্পে তেরোটি চরিত্র। 'শনির দৃষ্টি' গল্পে সাতটি চরিত্র। 'শ্বেত বসন্ত' গল্পে এগারোটি চরিত্র। 'লক্ষ্মীমণির স্বামী' গল্পে তেরোটি চরিত্র। 'সাত মায়ের এক ছেলে' গল্পে ছয়টি চরিত্র। 'আফিং কি করে হল' গল্পে দশটি চরিত্র। 'আগে কথা পরে কাজ' গল্পে ছয়টি চরিত্র। 'দুই চোরের গল্প' গল্পে নয়টি চরিত্র। 'ব্রাহ্মণ ভূত' গল্পে ছয়টি চরিত্র। 'নিখুঁত মানুষ' গল্পে দশটি চরিত্র। 'ভূত বৌ' গল্পে দুটি চরিত্র। 'ব্রহ্মদত্যির কথা' গল্পে পাঁচটি চরিত্র। 'হীরেমনের গল্প' গল্পে ছয়টি চরিত্র। 'চুনীর জন্ম' গল্পে পাঁচটি চরিত্র। 'শেয়াল ঘটক' গল্পে ছয়টি চরিত্র। 'চাঁদের কপালে চাঁদ' গল্পে তেরোটি চরিত্র। 'ভীতু ভূত' গল্পে চারটি চরিত্র। 'হাড় খটখটির মাঠ' গল্পে সাতটি চরিত্র। 'টেকো বউ' গল্পে সাতটি চরিত্র পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যদিকে আমরা যদি 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র চোদ্দটি গল্পের দিকে নজর দিই তাহলে সেখানেও চরিত্রের ছড়াছড়ি। প্রতিটি গল্পে নতুন নতুন চরিত্র তাদের নিজের কথা নিয়ে হাজির। প্রতিটি গল্পের চরিত্রগুলিকে যদি আমরা ভাগ করে নিই তাহলে দেখব 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' গল্প সংকলনের প্রথম গল্প 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে পাওয়া যাচ্ছে মোট আটটি চরিত্র। একইরকমভাবে দ্বিতীয় গল্প 'ঘুমন্ত পুরী' তে পাওয়া যাচ্ছে একটি চরিত্র। এছাড়াও সেপাই, লস্কর, দুয়ারী, সৈন্য, সামন্ত, মন্ত্রী, দাসীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। যদিও গল্পে এদের কোনো মুখের কথা নেই। তৃতীয় গল্প 'কাঁকনমালা, কাঞ্চনমালা' তে পাওয়া যাচ্ছে সাতটি চরিত্র। 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে চারটি চরিত্র। 'শীত বসন্ত' গল্পে বারোটি চরিত্র। 'কিরণমালা' গল্পে নয়টি

চরিত্র। 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে নয়টি চরিত্র। 'ডালিমকুমার' গল্পে পাঁচটি চরিত্র। 'পাতাল কন্যা মণিমালা' গল্পে আছে ছয়টি চরিত্র। এছাড়াও 'সোনার কাটি রূপার কাটি', 'শিয়াল পণ্ডিত', 'সুখু আর দুখু', 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী', 'দেড় আঙুলে' ইত্যাদি গল্পগুলোতে আছে যথাক্রমে ছয়টি, ছয়টি, দশটি, পাঁচটি ও এগারোটি চরিত্র।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত যে বইটি আমাদের আলোচনার অন্তর্গত সে বইটি হল 'রাঙাদির রূপকথা'। লেখক ত্রিভঙ্গ রায়। এই বইটিতে আছে মোট পাঁচটি গল্প। 'সাত মায়ের এক ছেলে', 'রাজপুত্তুর সবুর', 'বেহ্মদত্যি', 'চম্পাদল ও সহস্রদল', ও 'চন্দ্রধর'। এই পাঁচটি গল্পে আছে যথাক্রমে নয়টি, তেরোটি, ছয়টি, তেরোটি, ও পনেরোটি চরিত্র।

দুই শতাব্দীর আলাদা সময়কালের এই তিনটি গল্পসংকলনের সর্বমোট একচল্লিশ(৪১) টি গল্পের এই যে এত এত চরিত্র দেখানো হয়েছে বা বলা যায় তুলে আনা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মুখের বক্তব্যকে সসম্মানে জায়গা দেওয়া হয়েছে তার পিছনে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। কি কারণে এত চরিত্রকে তুলে আনা হয়েছে তা বলার আগে আমরা দেখে নেব প্রতিটি গল্পের এত ধরণের চরিত্রের মধ্যে কোন কোন চরিত্রগুলি 'common' অর্থাৎ কোন চরিত্রগুলো অধিকাংশ গল্পে উপস্থিত, এবং কোন চরিত্রগুলি একটু পরিচিত গণ্ডির বাইরে,অর্থাৎ পরিচিত নয়।

আমরা আমাদের আলোচনায় যে তিনটি রূপকথা-উপকথার সংকলনকে নিয়েছি, সেই সংকলনের সবগুলি গল্প মিলিয়ে আমরা যে চরিত্রগুলি পেয়েছি সেই চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন মানুষ আছে তেমনভাবে রাক্ষস-রাক্ষসীও আছে। পশু-পাখির চরিত্র যেমন আছে তেমনি গাছ-গাছালির চরিত্রও আছে। কিছু খুব পরিচিত চরিত্র যেমন আছে তেমনভাবে একেবারেই পরিচিত নয়- এরকম চরিত্রও আছে। তিনটি সংকলনের অধিকাংশ গল্পে যে পরিচিত চরিত্রগুলি আমরা পেয়েছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা, মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, রাক্ষস-রাক্ষসী, দাসী। এমন কিছু চরিত্র পাচ্ছি যারা মানুষ নয় কিন্তু মানুষের মতো

কথা বলে। এদেরকে আমরা বলছি সর্বজ্ঞ কথক। সর্বজ্ঞ কথক বলছি কারণ তারা গল্পের শুরু থেকে শেষ সবটাই জানে। এরা হল ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাচ্চা, শুকপাখি। সব গল্পেই কিছু অপরিচিত চরিত্র পাচ্ছি যেমন বামুন, বামনী, পেয়াদা, রাখাল, কুকুর, পাখি, পাখির বাচ্চা, ওঝা, জমিদার, ব্যাধ, নাপিত, কুমোর, তুলসীগাছ, ষাঁড়, কলাগাছ, তুলোগাছ, ফকির, বিধাতা পুরুষ, পাহারাওয়ালা, মা কালী, সরাইওয়ালা, দুর্গা, শিব, বণিক, মুদী, বাছুর, জেলে, মাঝি, ইঁদুর, বেড়াল, বাঁদর, বুনো শুয়োর, গিন্নি, বটগাছ, গোমস্তা, মোড়ল, সূচ, মালী, জহ্লাদ, টিয়া, পদ্মফুল, মাছ, সূতাশঙ্খ, কাঠুরিয়া, ব্যাঙ, চোর, ধোপা, বাতাস, গাই, শেওড়াগাছ, ঘোড়া, কুমির, শিয়াল ইত্যাদি। আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এই অপরিচিত চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত লোকজন আছে তেমনই বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে, যারা কথা বলছে। প্রতিটি গল্পে এই সমস্ত চরিত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ অবদানও পাচ্ছি। এবং এও আমাদের নজরে পড়েছে যে প্রতিটি চরিত্রের মুখের ভাষা একে অপরের থেকে আলাদা। এখন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তৈরি হয় যে এত এত ভিন্নধরণের চরিত্র আনার কারণ কি? প্রত্যেকের মুখের ভাষা আলাদা হওয়ারই বা কারণ কি? এত ধরণের চরিত্রের মুখের আলাদা আলাদা ভাষাকে সামনে আনার প্রয়োজন পড়লো কেন?

এটা আমাদের সবার জানাবোঝার মধ্যে আছে যে ঠাকুরমার ঝুলি প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে ১৯০৭ সালে। ঠাকুরমা'র ঝুলি প্রকাশের কিছু আগে প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলার উপকথা' (১৮৮৩) এবং ঠাকুরমার ঝুলির প্রায় ৬৩ বছর পর প্রকাশিত হচ্ছে 'রাঙাদির রূপকথা' (১৯৭০)। ঠাকুরমা'র ঝুলির প্রকাশের সময়কালকে যদি আমরা একটা সন্ধিক্ষণ হিসাবে ধরে নিই তাহলে 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' প্রকাশের প্রায় ৫২ বছর আগে 'বর্ণপরিচয়'এর মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে প্রমিতকরণ বা Standardization করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। বাংলা ভাষাকে প্রমিতকরণের চেষ্টা শুরু হয়েছে আসলে আরো অনেক আগে থেকেই। উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই আসলে

বাংলা ভাষার মান্যায়নের চেষ্টা আমরা দেখতে পেয়েছি। বাংলা ভাষা কে প্রমিতকরণ বা standardization এর চেষ্টার সর্বচ্চো স্তর হিসাবে আমরা বর্ণপরিচয় কে গ্রহণ করতে পারি। বর্ণপরিচয়ের আগে 'শিশুশিক্ষা', 'বর্ণমালা', 'নতুন বর্ণমালা', 'শিশুসেবধি', 'নীতিবোধ', প্রভৃতি প্রাইমারও বাংলা ভাষাকে প্রমিতকরণের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়কে আমরা সেই চেষ্টার অন্যতম সর্বচ্চো জায়গা দিতে পারি। কারণ বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' একমাত্র প্রাইমার যা এখনো পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ ঘরে পাওয়া যায়। এখনো শিশুর প্রথম 'বর্ণ' পরিচয় 'বর্ণপরিচয়'এর মাধ্যমেই শুরু হয়।

প্রমিতকরণ বা মান্যিকরণ বলতে আমরা বুঝি সুসংহত রূপ। বাংলা ভাষার প্রমিতকরণ মানে এক ধরণের বাংলা যা সবাই শিখবে। এক ধরণের বাংলা যা সবাই বলবে। এক ধরণের বাংলা যা সবাই লিখবে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝাতে সুবিধা হবে আমাদের। আমরা যদি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' থেকে দৃষ্টান্ত দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো –

"পাঠশালায় ছুটী হইলে গোপাল বাড়ী আসিয়া আগে পড়িবার বইখানি ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়। পরে কাপড় ছাড়িয়া হাত পা ও মুখ ধোয়। গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন গোপাল তাই খায়। খাইয়া আপনার ভাই ভাগিনী গুলি লইয়া খানিক খেলা করে। পরে পাঠশালায় যে নূতন পাঠ পড়িয়া আইসে সেই পাঠ অভ্যাস করিতে বসে। পাঠ অভ্যাস হইলে আহার করিয়া শয়ন করে"।[১৬]

গোপালের পাঠশালা যাওয়া থেকে শুরু করে রাতের খাবার খেয়ে শুতে যাওয়া পর্যন্ত যে বিবরণ দেওয়া হল তা আসলে মান্য বাংলার আদর্শ রূপ। যাকে বলা হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রমিত বা standard ধরণ। এই ভাষাতেই কথা বলা উচিত, এই ভাষাতেই কথা বলতে হবে সবাইকে, এরকম প্রচেষ্টা আমরা বর্ণপরিচয় এবং তার আগের প্রাইমারগুলির মধ্যে লক্ষ্য করেছি। বাংলা ভাষাকে প্রমিত করার এই যে প্রচেষ্টা, এই চেষ্টা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বর্ণপরিচয় প্রকাশের ৫২ বছর পর প্রকাশিত 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'তে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা ভাষার প্রমিত রূপের

পাশাপাশি আরো অনেক সমাজ-উপভাষা, যেগুলি আমরা রূপকথা-উপকথার গল্পগুলোর চরিত্রগুলির মাধ্যমে পাচ্ছি। যে শৈশবের নির্মাণ করার জন্য বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ 'বর্ণপরিচয়' এবং তার সমসাময়িক প্রাইমারগুলির মাধ্যমে শুরু হয়ে গেছিল 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'তে এসে আমরা তার অন্যথা দেখতে পেলাম। একটা শিশুর শৈশব নির্মাণ করার জন্য আসলে একইসঙ্গে দুই ধরণের শিক্ষাকে গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ শেখানোর পাশাপাশি শিশুকে প্রমিত থেকে বিচ্যুত একটা ভাষারও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আসলে। কেন একইসঙ্গে দুই রকমের ভাষার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে? কেন প্রমিত ভাষার পাশাপাশি Diverted বাংলা ভাষা অর্থাৎ আরো অনেক রকমের বাংলা ভাষা শিশুকে শেখানো হচ্ছে? কেন গল্পগুলির এত চরিত্রের আলাদা আলাদা ভাষার কথা শিশুকে জানানোর প্রচেষ্টা? পরের আলোচনায় আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের বাঙালির শিক্ষাচিন্তা কাদের জন্য? প্রশ্ন যদি এরকম হয় তাহলে বলা যায় উনিশ শতকে শিক্ষা নিয়ে নতুন করে যে ভাবনাচিন্তা তা আসলে মূলত শহরকেন্দ্রিক। শহরের শিক্ষিত মানুষজন যারা কিনা বাঙালি আবেগ ভুলতে বসেছিল, বশবর্তী হয়ে পড়ছিল ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষায়, তাদেরকে তাদের মানসিকতায় বাঙালি সত্তাকে রোপন করাই ছিল সে যুগের শিক্ষাচিন্তকদের মূল উদ্দেশ্য। আসলে উনিশ শতকের শিক্ষাচিন্তায় এক বিপুল অংশের মানুষ যারা প্রান্তে অবস্থান করে তাদের কোনো গুরুত্বই ছিল না। গ্রামের মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো ভাবনাচিন্তাই করেননি সে যুগের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। সেই কারণেই বাংলা ভাষার যে প্রমিত রূপ তা শুধুমাত্র কলকাতা এবং কলকাতা শহরকেন্দ্রিক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতা শহরের বাইরে আরও যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল আছে, তাদের যে আলাদা আলাদা মুখের ভাষা আছে সে ভাষাকে অগ্রাহ্য করে একটা মান্য রূপকে প্রতিষ্ঠা করা হল। প্রমিতকরণের কাজটা আসলে শুরু হল কেন্দ্র থেকে। যে কেন্দ্রের নাম কলকাতা। এটা

তো প্রতিষ্ঠিত সত্য যে কোন কিছুর প্রমিতকরণ শুরু হয় কেন্দ্র থেকে, প্রান্ত থেকে নয়। কিন্তু যতই প্রান্তকে অগ্রাহ্য করা হোক না কেন, প্রান্তে থাকা মানুষগুলোর নিজস্ব নিজস্ব ভাষাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হোক না কেন, মানুষের মুখের ভাষা, যে ভাষা সে জন্মের পর থেকে বলতে শুরু করেছে, যে ভাষার চর্চা বাড়িতে মায়ের মুখ থেকে শুনে বলতে শুরু করেছে সে ভাষাকে ভুলিয়ে দেওয়া কার্যত সম্ভব নয়। চাইলেও কেউ ভুলিয়ে দিতে পারবে না। প্রমিতকরণের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও মানুষের মুখের ভাষা যাকে আমরা সমাজ-উপভাষা বলছি তাকে কখনোই ভুলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রমিতকরণের মাধ্যমে যতই কেন্দ্র অভিমুখী একটা শক্তিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত Dialect কে মুছে ফেলা যায়না। প্রমিতকরণের চেষ্টা খাতায় থাকবে, বইয়ের পাতায় থাকবে কিন্তু মানুষের মুখ থেকে তার নিজস্ব কথোপকথনের ভাষাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যাবেনা। বিবেকানন্দও তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে ভাষার প্রমিতকরণের এই চেষ্টাকে ভালোভাবে দেখেননি –

"পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা – যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর – সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না;"[১৭]

এখানে বিবেকানন্দ আরো কিছুটা এগিয়ে গেছেন। প্রমিত বলে কিছু হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাষার একটা প্রমিত রূপ গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের মুখের নিজস্ব ভাষাকে ভুলিয়ে দেওয়া কার্যত অসম্ভব।

প্রতিটি জীবন্ত ভাষার মূল ধর্মই হল পরিবর্তনশীলতা। ভাষা তার নিজের নিয়মে চলে। বিকশিত হয়। কিন্তু যে ভাষা পরিবর্তনশীল নয় সে ভাষা মৃত ভাষা। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা সংস্কৃত ভাষার কথা বলতে পারি। সংস্কৃত ভাষার যে ঐশ্বর্য, যে মহত্ত্ব, যে প্রসারতা তার সবটাই হারিয়ে গেছে একটাই কারণের জন্য। পরিবর্তনহীনতা। এই পরিবর্তনহীনতার জন্য দায়ী সে যুগের বৈয়াকরণরা। একটা নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে গিয়ে অন্য কোনো বিকল্প নিয়মের সন্ধান করেননি বা বলা যায় সন্ধান করতে চাননি সে যুগের বৈয়াকরণরা। যে ভাষা একটা সময় মানুষের মুখে মুখে ফিরত, পরস্পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করার যে ভাষা ছিল একমাত্র মাধ্যম সে ভাষায় আজ কেউ কথা বলে না। আসলে প্রতিটি মানুষ চায় খুব সহজে কথা বলতে। খুব সহজে উচ্চারণ করা যায় যা কিছু তাই মানুষ বলতে চায়। তাই ভাষা পরিবর্তন হয়। এবং ঠিক এই কারণেই মানুষের মুখের ভাষা কে মুছে ফেলা যায়না যতই মান্যিকরণের চেষ্টা করা হোক না কেন। যতই বলা হোক না কেন ভাষার পরিশীলিত, মার্জিত রূপ বলতে হবে ততই আরো বেশি করে মানুষ তার মুখের ভাষাকে অর্থাৎ Dialect কে উচ্চারণ করে যাবে। ভাষার মার্জিত রূপ বলবে না, এই অনড় মনোভাব নয়। বলবে না কারণ সে তার নিজের ভাষাতে কথা বলে আসছে ছোটো থেকে। তাই মুখের ভাষা শেষ পর্যন্ত ভুলে যাবেনা। ভুলতে চাইবেনা।

আগেই বলেছিলাম আমরা যে একই সঙ্গে দুই রকমের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে শিশুকে। ভাষার প্রমিত রূপ শেখানোর পাশাপাশি প্রমিত থেকে বিচ্যুত একটা ভাষা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের আলোচিত 'বাংলার উপকথা', 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' এবং 'রাঙাদির রূপকথা' গল্পসংকলনের গল্পগুলি শিশুকে আসলে প্রমিত থেকে বিচ্যুত যে ভাষা তার জানান দিচ্ছে। এই বইগুলো শিশুদের জন্য প্রথম যেখানে standard বা মান্য বাংলার বিপ্রতীপে dialectical feature কে ধরে রাখার চেষ্টা। এর আগে এই চেষ্টা করেছিলেন উইলিয়াম কেরি তার 'কথোপকথন' নামক বইতে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। কেরি সাহেবের এই চেষ্টা

প্রথম হলেও সুসংহত চেষ্টা নয়। তিনি লিখেছিলেন ইংরেজ রাজকর্মচারীদের জন্য। বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা যে বিভিন্ন সমাজ-উপভাষার লোকজন আছে তাদের ভাষা সম্বন্ধে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের ওয়াকিবহল করার জন্য তিনি এই বই লিখেছিলেন। মুখের ভাষাকে সুসংহতভাবে ধরা আছে এমন বই আরও কিছু আমরা পাবো। আমরা পাবো প্যারিচাঁদ মিত্র-এর 'আলালের ঘরের দুলাল'কে। পাবো কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নকশা'কে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'কে। এই বইগুলির কোনটাই আসলে ছোটোদের জন্য নয়। 'বাংলার উপকথা', 'ঠাকুরমা'র ঝুলি', 'রাঙাদির রূপকথা' বইগুলি প্রথম বই যেখানে সমাজের নানা প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের মুখের আলাদা আলাদা ভাষা সম্বন্ধে শিশুকেও সম্যক ধারণা দেওয়া হচ্ছে। এই সংকলনগুলির দ্বারা social dialect বা dialectical feature কে শিশুর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। ১৯০৭ সালে শিশুর কাছে এই বার্তা পৌছাচ্ছে যে এগুলিও আসলে বাংলা ভাষা। কিন্তু ১৯০৭ এ কেন জানানো হচ্ছে? আগে কেন জানানো হয়নি? আমাদের মনে পড়বে ১৯০৫ এর স্বদেশী আন্দোলনের কথা। যাকে আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বলে থাকি। স্বদেশী আন্দোলন অনেক পরিমাণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ। এবং এই জাতীয়তাবাদের উন্মেষে মানুষের অবয়ব, বর্ণ, ধর্ম অপেক্ষা ভাষার গুরুত্ব অনেক বেশি। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা প্রমাণ করাই ছিল তখন এক এবং একমাত্র। স্বদেশী সাহিত্য নিয়ে চিন্তাভাবনা সেই সময়ে এত বেশি পরিমাণে দেখা গেছিল যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৭ সাল অর্থাৎ ১৯০৫ সাল পরবর্তী দুই বছর যখন আসলে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সচেতনতা বাঙালির মধ্যে প্রবল। বাংলা দেশ অর্থাৎ অখণ্ড বাংলা সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা সর্বচ্চো পর্যায়ে। তাই সবাইকে এই জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে আনতে হবে। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে, বাঙালি জাতি সম্বন্ধে একরকমের আদর্শবোধ সবার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই শিশুও

বাদ নয়। তাদের মধ্যেও জাগাতে হবে জাতীয়তাবাদের ধারণা ছোটো থেকেই। যেখানে যে আছে তাদের সবাইকে জায়গা দিতে হবে। সবার মুখের ভাষাকে মান্যতা দিতে হবে।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অখণ্ড বাংলার সমস্ত অংশের সমস্ত মানুষের মুখের ভাষাকে শিশুর কাছে জানান দেবার কাজটি করছে এই রূপকথা-উপকথার সংকলন। বাংলার ভাষার যে এত রূপ আছে তা শিশুকে জানানো প্রয়োজন। তাই এই সংকলনগুলিতে এত ধরণের চরিত্রকে তুলে আনা হয়েছে। তাদের মুখের ভাষাকে যেগুলিকে আমরা সমাজ-উপভাষা বলছি তার ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের ১ম পাঠ থেকে –

"ঘোষালদের একটি ছেলে আছে। তার নাম গোপাল। গোপালের বয়স ছ বছর। গোপাল যা পায় তাই খায় যা পায় তাই পরে। ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না। তার বাপ মা যখন যা বলেন তাই করে কখন তাঁদের কথা অন্যথা করে না। ভাই ভগিনী গুলিকে অতিশয় ভালবাসে। কখন তাদের সহিত ঝগড়া করে না ও তাদের গায় হাত তোলে না। এজন্যে তার পিতা মাতা তাকে বড় ভাল বাসেন"[১৮]

—এই ধরণের মার্জিত বাংলা শিশুকে শেখাচ্ছে প্রাইমারগুলি। অন্যদিকে 'কিরণমালা' গল্পে তিন বোনের কথা যদি আমরা দেখি—

"দ্যাখ লো, আমার যদি রাজবাড়ির ঘেসেড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়, তো আমি মনের সুখে কলাই ভাজা খাই"[১৯]।

মেজো বোন বলছে –

"আমার যদি রাজবাড়ির সূপকারের সঙ্গে বিয়ে হয়, তো আমি সকলের আগে রাজভোগ খাই"[২০]

ছোটো বোন বলছে –

"আমার যদি রাজার সঙ্গে বিয়ে হইত; তো আমি রানী হইতাম"[২১]।

মান্য ভাষার সঙ্গে এ ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই। একেবারেই আলাদা। অপরিচিত। এই ভাষাকেও শিশুর কাছে পরিচিত করানো হচ্ছে। সমাজ-উপভাষা সম্বন্ধে শিশুকে ধারণা দেবার দরকার পড়ছে।

রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলিতে এই যে সমাজ-উপভাষার ব্যবহার সে সম্বন্ধে কেন ধারণা দেবার প্রয়োজন পড়ছে তা আমরা উপরের আলোচনায় বলার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা আমাদের আলোচনার যে তিনটি বই সেই বইগুলিতে যে চরিত্রগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের ব্যবহৃত মুখের ভাষা ব্যবহার এবং তা থেকে তাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমেই আমরা ফাংশানাল ভ্যারিয়েবেল (নির্বাহী চল) গুলিকে কে দেখতে চাইব। পুরো বিষয়টাকে আমরা একটা ছকের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করব।

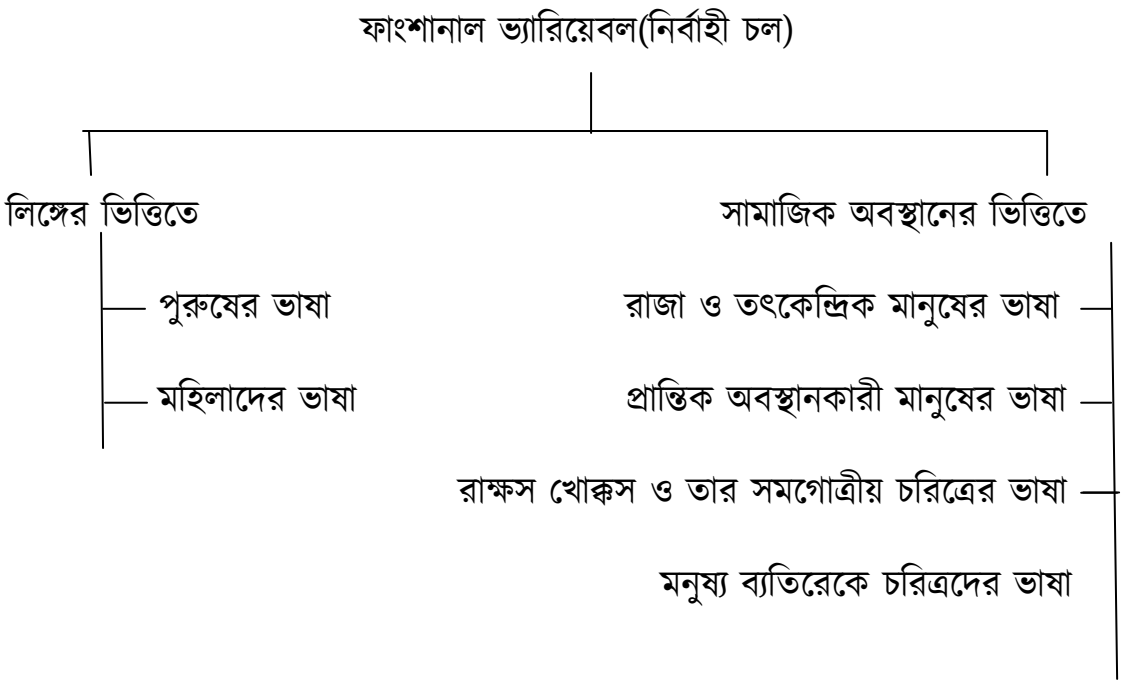

‘সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে’ আমরা যে শ্রেণিবিভাগ করেছি সেই বিভাগের প্রথম যে বিভাগ তা হল ‘রাজা ও তৎকেন্দ্রিক মানুষের ভাষা’। রাজা ও তৎকেন্দ্রিক মানুষ বলতে আমরা রাজা, রাজপুত্র, রাজরানী, রাজকন্যা, মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্রদের বুঝবো। এইসব চরিত্রগুলির মুখের ভাষা যা এই সংকলনগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে সেই মুখের ভাষার ভিত্তিতে আমরা এইসব চরিত্রদের

কথা বলার ধরণ এবং মনোভাব বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমেই আমরা রাজার মুখের ভাষাকে নিয়ে আলোচনা করব। তারপর ক্রমে রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাণী, মন্ত্রী, মন্ত্রীপুত্রদের মুখের ভাষা নিয়ে আলোচনা করব। তিনটি সংকলন মিলিয়ে আমরা 'রাজা'র যে মুখের ভাষা পেয়েছি অর্থাৎ রাজা যাদের যাদের সাথে কথা বলছে তার ভিত্তিতে আমরা যদি কথা বলার ধরণ এবং মনোভাব দেখি তাহলে যা পাবো –

রাজার ব্যবহৃত মুখের ভাষা:

১) রাজা যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে সেই বলা কথার মধ্যে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাবো আমরা। যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা হল 'কৃতজ্ঞতা'। উদা: "তুমি কোন দেশের ভাগ্যবান রাজার রাজপুত্র, আমাদিগে মরণ ঘুমের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, ঘুমন্ত পুরী, পৃ: ৯)

২) রাজা যখন ভৃত্যরূপী রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে সেই বলা কথার মধ্যে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একইসঙ্গে এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখতে পাবো আমরা। এখানে রাজার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'কৃতজ্ঞতা'। উদা: "কে বাবা তুমি, স্বগগের কোন দেবতাদের ছেলে, ভৃত্য হলে কোন ছলে? রাজা-প্রজা রাজ্যসুদ্ধু সবাইকার প্রাণ বাঁচালে – দেশের দশের পিতা হলে।" (রাঙাদির রূপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ২০)

৩) রাজা যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজার যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'ভরসা বা বিশ্বাস'। উদা: "দেখ,

আমি বুড়ো হয়েছি, কিন্তু তোমরা বলিষ্ঠ জোয়ান। আমার রাজ্যের লোকে চোর-ডাকাতের ভয়ে তিষ্ঠুতে পারছে না, এ কি করে সম্ভব হল? আমি আশা করছি তোমরা চোর-ডাকাত ধরে, দেশের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনবে।'' (বাংলার উপকথা, আগে কথা পরে কাজ, পৃ: ১৪৯)

৪) রাজা যখন বন্ধু রাখালের সাথে কথা বলছে, সেখানে কার্যকারণাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'অনুতাপ'। উদা: "বন্ধু আমার দোষ নিও না, শত জন্মে তপস্যা করিয়াও তোমার মত বন্ধু পাইব না। আজ হইতে তুমি আমার মন্ত্রী। তোমাকে ছাড়িয়া আমি কত কষ্ট পাইলাম; আর ছাড়িব না"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা, পৃ: ৬৮)

৫) রাজা যখন রাণীদের সাথে কথা বলছে সেই বলা কথায় নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'হুমকি'। উদা: "ছেলে না হইতে আবার শিকল নাড়া দিলে আমি সব রাণীকে কাটিয়া ফেলিব"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সাত ভাই চম্পা, পৃ: ৭০)

৬) রাজা যখন রাণীর সাথে কথা বলছে সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা হল 'রাগ'। উদা: "এ কী? অসময়ে ঘণ্টা বাজাও, আমার কথা শোনো না তুমি?'' (রাঙাদির রূপকথা, চন্দ্রধর, পৃ: ৮২)

৭) রাজা যখন রাণীর সাথে কথা বলছে সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজার 'নির্দেশ' মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "অন্য সময়ে কখনো ঘণ্টা বাজিও না, তাতে আমার কাজের বড় ক্ষতি হয়। শুধু তোমার ছেলে হবার সময় বাজিও।'' (বাংলার উপকথা, চাঁদের কপালে চাঁদ, পৃ: ২৩৭)

৮) রাজা যখন নিম্নশ্রেণির মানুষ অর্থাৎ জল্লাদের সাথে কথা বলছে, সেখানে আমরা নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখছি। যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা হল 'নির্দেশ বা আদেশ'। উদা: "শীত বসন্তকে কাটিয়া রাণীকে রক্ত আনিয়া দাও"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৭৭)

৯) রাজা যখন নিম্নশ্রেণির মানুষ অর্থাৎ মালীর সাথে কথা বলছে সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজার যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা হল 'নির্দেশ বা আদেশ'। উদা: "তবে সেই ফুল আন, পূজা করিব।" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সাত ভাই চম্পা, পৃ: ৭১)

১০) রাজা যখন নিম্নশ্রেণির মানুষ অর্থাৎ ব্যাধের সাথে কথা বলছে সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজার যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'নির্দেশ বা আদেশ'। উদা: "কত দাম চাও বল।" (বাংলার উপকথা, হীরেমনের গল্প, পৃ: ২০৯)

১১) রাজা যখন রাজ্যের সাধারণ মানুষজন অর্থাৎ প্রজাদের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা হল 'নির্দেশ বা আদেশ'। উদা: "দেখ তো, বনের মধ্যে কে কাঁদে?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সোনার কাটি রূপার কাটি, পৃ: ১৬২)

১২) রাজা যখন রাজ্যের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ প্রজাদের সাথে কথা বলছে সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজার যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'নির্দেশ বা আদেশ'। উদা: "ঐ হাতির কোনো ক্ষতি কর না। ওকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো। বড় সুন্দর হাতি, পোষ মানলে চমৎকার হবে।" (বাংলার উপকথা, আফিং কি করে হল, পৃ: ১৪৩)

১৩) রাজা যখন মহর্ষি বা সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলছে, সেখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'আর্তি'। উদা: " – মহর্ষি, আমার কুমারকে বাঁচান, ধনরত্ন – যা চান তাই নিয়ে যান"। (রাঙাদির রূপকথা, রাজপুত্তুর সুবুর, পৃ: ৩৫)

১৪) রাজা যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে উল্লিখিত হওয়া চরিত্রদের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। যা মনোভাব প্রকাশিত হচ্ছে তা হল 'নিঃস্ব'। উদা:

“হায়রে আমার হীরেমন! হায়রে আমার হীরেমন! কোথায় তুমি!” (বাংলার উপকথা, হীরেমনের গল্প, পৃ: ২১১)

রাজপুত্রের ব্যবহৃত মুখের ভাষা:

১) রাজপুত্র যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হওয়া চরিত্রগুলোর সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা হল ‘তাচ্ছিল্য’। উদা: “বেশ বেশ, তোদের মায়েরা কোথায় বল; আনিয়া চিড়িয়াখানায় রাখিব”। (ঠাকুরমা’র ঝুলি, কলাবতী রাজকন্যা, পৃ: ৩৪)

২) রাজপুত্র যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হওয়া চরিত্রের সাথে কথা বলছে সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজপুত্রের যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল ‘আদেশ’। উদা: “হেই! শক্ত মুগুর, দড়ি ওরে দে না সাগর পার করে!” (বাংলার উপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ১৩৭)

৩) রাজপুত্রেরা যখন নিম্নশ্রেণির মানুষ অর্থাৎ মাঝির সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজপুত্রের যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা হল ‘আদেশ বা নির্দেশ’। উদা: “ময়ূরপঙ্খীতে বানর আর পেঁচা কেন রে? এ দুইটাকে জলে ফেলিয়া দে”। (ঠাকুরমা’র ঝুলি, কলাবতী রাজকন্যা, পৃঃ: ৪২)

৪) রাজপুত্রেরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হল ‘হতাশা’। উদা: “হায় ভাই,

বুদ্ধু ভাই থাকিলে আজি এখন রক্ষা করিত! হায় ভাই, ভূতুম ভাই থাকিলে এখন রক্ষা করিত!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, কলাবতী রাজকন্যা, পৃ: ৪২)

৫) রাজপুত্র যখন রাজকন্যার সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা'। উদা: "কি! রাজকন্যার এত তেজ, রাজপুত্রদিগকে নফর করিয়া রাখে! রাজকন্যার রাজ্য আটক কর"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৮৫)

৬) রাজপুত্র যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'সাহসিকতা'। উদা: "আমরা খোক্কস মারিতে আসিয়াছি!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, নীলকমল আর লালকমল, পৃ: ১২৪)

৭) রাজপুত্র যখন রাজার সাথে কথা বলছে সেখানে কার্যকারণাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজপুত্রের 'যুক্তিবাদী' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। একইসঙ্গে রাজপুত্রের আভিজাত্যও প্রকাশিত। উদা: "তার গর্দান নেওয়া উচিত, মহারাজ। কিন্তু তার আগে দেখা উচিত সে সত্যি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কি না।" (বাংলার উপকথা, আগে কথা পরে কাজ, পৃ: ১৫২)

৮) রাজপুত্ররা যখন রাক্ষস খোক্কসদের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'সাহসিকতা'। উদা: "নীলকমলের আগে লালকমল জাগে/ আর জাগে তরোয়াল/ দপ দপ করে ঘিয়ের দীপ জাগে/ কার এসেছে কাল?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, নীলকমল আর লালকমল, পৃ: ১২৫)

৯) রাজপুত্ররা যখন রাক্ষসের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজপুত্রদের যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'সাহসিকতা'। উদা: "সহস্র-দল জাগে, চম্পক-দল জাগে, দুই পক্ষিরাজ জাগে!" (বাংলার উপকথা, রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৭৫)

১০) রাজপুত্রেরা যখন রাণীদের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'সন্দেহ'। উদা: "মা, থালে ছাইয়ের গুঁড়া কেন?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সোনার কাটি রূপার কাটি, পৃ: ১৬০)

১১) রাজপুত্র যখন রাণীর সাথে কথা বলছে সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজপুত্রের যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'ঔদ্ধত্য'। উদা: "না, মা, আমি নামব না। আমি বিদেশ-ভ্রমণে যাব। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও তো উঠে এসো। নইলে এই আমি নৌকো নিয়ে রওনা হলাম।" (বাংলার উপকথা, চুনীর জন্ম, পৃ: ২১৯)

১২) রাজপুত্র যখন সদাগরের সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পাচ্ছে তা হল 'আদেশ বা নির্দেশ'। উদা: "আপনার কন্যা সবুর চান, আমার আছে, নিয়ে যান – দেবেন তাকে"। (রাঙাদির রূপকথা, রাজপুত্তুর সবুর, পৃ: ৩১)

১৩) রাজপুত্র যখন মন্ত্রীপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'নির্দেশ'। উদা: "বলে ফেল, নইলে তোমার শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে"। (বাংলার উপকথা, ফকিরচাঁদ, পৃ: ৫২)

১৪) রাজপুত্র যখন মন্ত্রীপুত্রের সাথে কথা বলছে তখন প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজপুত্রের 'জিজ্ঞাসু' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। উদা: "সর্বনাশ! কেমন করিয়া নিবে?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, পাতাল-কন্যা মণিমালা, পৃ: ১৪৯)

রাজকন্যার ব্যবহৃত মুখের ভাষা:

১) রাজকন্যা যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'আত্মসমর্পণ'। উদা: "এখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। তা চল; কিন্তু তুমি আমাকে এমনি নিতে পারবে না; আমি এই কৌটায় থাকি, তুমি কৌটায় করিয়া আমাকে লইয়া চল"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, কলাবতী রাজকন্যা, পৃ: ৪৫)

২) রাজকন্যা যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রগুলির সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'জিজ্ঞাসা'। উদা: "সোনার টিয়া, বল তো আমার আর কি চাই?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৮৩)

৩) রাজকন্যা যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রগুলির সাথে কথা বলছে, তখন সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজকন্যার 'জিজ্ঞাসু' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। উদা: "ওরে আমার আদরের পাখি, বল দিকিনি, রত্ন পরে আমাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে?" (বাংলার উপকথা, চুনীর জন্ম, পৃ: ২২০)

৪) রাজকন্যা যখন নিম্নশ্রেণির মানুষের সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'নির্দেশ বা আদেশ'। উদা: "দাসী লো দাসী, কপিলা গাইয়ের দুধ আন, কাঁচা হলুদ বাটিয়া আন; আমার সোনার টিয়াকে নাওয়াইয়া দিব!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৯২)

৫) রাজকন্যা যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'অনুরোধ'। উদা: "দুয়ার খুলিয়া

দিন, গজমোতি যিনি আনিয়াছেন তাঁহাকে গিয়ে বরণ করিব"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৯৩)

৬) রাজকন্যা যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেই কথা বলার ক্ষেত্রে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এখানে রাজকন্যার যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা হল 'জেদ'। উদা: "বাবা, একটা রাস্তার ছেলের হাতে দেখলাম চমৎকার ঝকঝকে একটা লাল গুলি। ঐ গুলি আমার চাই, নইলে আমি উপোস করে মরব।" (বাংলার উপকথা, চুনীর জন্ম, পৃ: ২২০)

৭) রাজকন্যা যখন রাক্ষসীর সাথে কথা বলছে, সেখানে সন্দেহবাচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'ভয়'। উদা: "কাঁদি আয়ীমা, কবে বা তুই মরিয়া যাইবি, আর সকল রাক্ষসে আমাকে খাইয়া ফেলিবে"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সোনার কাটি রূপার কাটি, পৃ: ১৭০)

৮) রাজকন্যা রাক্ষসীর সাথে যখন কথা বলছে তখন বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাজকন্যার 'বিস্ময় বা অবাক' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। উদা: "আমি ছাড়া তো এখানে মানুষ নেই। তাহলে আমাকেই ধরে খাও!" (বাংলার উপকথা, রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৮১)

রাণীদের ব্যবহৃত মুখের ভাষা:

১) রাণীরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'অনুরোধ'। উদা: "বোন, তুই

বাটনা বাটিবি, শিকড়টি আগে বাটিয়া দেনা, সকলে একটু খাই"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, কলাবতী রাজকন্যা, পৃ: ৩০)

২) রাণীরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তখন প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'কষ্ট বা বেদনার' মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "ছেলে যদি কাছে রয় আজ না হয় কাল মরবে নিশ্চয়। পেটের ছেলে শুকিয়ে মরে – মা হয়ে কে সইতে পারে?" (রাঙাদির রূপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ১১)

৩) রাণীরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা হল 'অনুরোধ'। উদা: "দিদি, তোমরা আমার কথা রাখ, ছয় বাছা গেছে, এসো সকলে মিলে এই শেষেরটিকে মানুষ করি।" (বাংলার উপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ১৩৩)

৪) রাণী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে তা হল 'ক্রোধ'। উদা: "কি! সতীনের ছেলে, সেই আমাকে গালমন্দ দিল। শীত-বসন্তের রক্ত নহিলে আমি নাইব না"। (ঠাকুরমার ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৭৬)

৫) রাণী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে সন্দেহবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তা হল 'অনিশ্চয়তা'। উদা: "ঘণ্টা বাজালে তুমি সত্যি আস কি না দেখলাম।" (বাংলার উপকথা, চাঁদের কপালে চাঁদ, পৃ: ২৩৭)

৬) রাণী যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'অনুরোধ'। উদা: "কি হয়েছে বাবা, আমাকে বল"। (বাংলার উপকথা, রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৮৫)

৭) রাণীরা যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রগুলির সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'উৎসাহ'। উদা: "হীরেমন, লোকে বলে তুমি ভারি বুদ্ধিমান পাখি। বল দেখি আমাদের মধ্যে কে সব চাইতে সুন্দর আর কে সব চাইতে কদাকার?" (বাংলার উপকথা, হীরেমনের গল্প, পৃ: ২১০)

মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্রদের ব্যবহৃত মুখের ভাষা:

১) মন্ত্রী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা হল 'ভয়'। উদা: "মহারাজ! ভয়ে বলি?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, কিরণমালা, পৃ: ৯৫)

২) মন্ত্রী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মন্ত্রীর যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা হল 'ইচ্ছা'। উদা: "মহারাজ, সন্তান নইলে কি পুরী মানায় – রাজবংশ যে লোপ পায়, রাজ-রাজত্ব রসাতলে যায়। তা মা-লক্ষণ মেয়ে দেখে আর একটি বিয়ে করুণ।" (রাঙাদির রূপকথা, চন্দ্রধর, পৃ: ৭৭)

৩) মন্ত্রীপুত্র যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'অনুরোধ'। উদা: "বন্ধু, পাহাড় মুল্লুকে বড় বিপদ-আপদ; আইস, ঐ গাছের ডালে উঠিয়া কোন রকমে রাতটা কাটাইয়া দিই"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, পাতাল কন্যা মণিমালা, পৃ: ১৪৮)

৪) মন্ত্রীপুত্র যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'অনুরোধ'। উদা: "ভাই ও-কথা বলতে আমাকে পেড়াপীড়ি কর না, ওতে আমার সর্বনাশ হবে।" (বাংলার উপকথা, ফকিরচাঁদ, পৃ: ৫২)

৫) মন্ত্রীপুত্র যখন রাজকন্যার সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'সাহসিকতা'। উদা: "রাজকন্যা, ভয় নাই; কাল অজগরকে আমরা মারিয়া ফেলিয়াছি। এই রাজপুত্র তোমার বর"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, পাতাল কন্যা মণিমালা, পৃ: ১৫১)

৬) মন্ত্রীপুত্র যখন রাজকন্যার সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল 'নির্দেশ বা আদেশ'। উদা: "ছি অমন করে কি কাঁদতে আছে? আজ রাতেই তোমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি যেমন যেমন বলব, ঠিক তেমনটি করতে হবে।" (বাংলার উপকথা, ফকিরচাঁদ, পৃ: ৪৪)

৭) মন্ত্রীপুত্র যখন নিম্নশ্রেণির মানুষের সঙ্গে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'জানতে চাওয়া'। উদা: "বা! এ যে রূপকথার মত শোনাচ্ছে আর ফকিরের মা অর্থাৎ ফকিরচাঁদ কি তাঁর বখশিস পেয়েছে? রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে? সেকি অর্ধেক রাজ্যের মালিক হয়েছে?" (বাংলার উপকথা, ফকিরচাঁদ, পৃ: ৪১)

সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা চরিত্রগুলির যে ভাগ করেছিলাম তার মধ্যে আমরা 'রাজা ও তৎকেন্দ্রিক মানুষের ভাষা' নামক প্রথম বিভাগটি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা দেখতে পেলাম রাজা এবং তার চারপাশে থাকা মানুষগুলো কিভাবে কথা বলে। আমরা তাদের মনোভাবও দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখন আমরা এই শ্রেণিবিন্যাসের দ্বিতীয় বিভাগ অর্থাৎ 'প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষের ভাষা' নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কিভাবে কথা বলছে, কি

মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা খুঁজে দেখব। আমাদের আলোচিত তিনটি সংকলন মিলিয়ে আমরা যে চরিত্রগুলিকে পাবো এই বিভাগের মধ্যে তারা হল – বামুন, বামুনের বউ, পেয়াদা, সাধু, ওঝা, ব্যাধ, ব্যাধের বউ, তাঁতি, দাসী, কুমোর, কুমোর বউ, ধাইমা, নাপিত, নাপিতের বউ, সন্ন্যাসী, মুনি, পাহারাওয়ালা, সরাইওয়ালা, বেয়ারা, মুদী, জেলে, মাঝি, মোড়ল, গোমস্তা, দোকানি, প্রজা, মালী, জহ্লাদ, কাঠুরিয়া, চোর, কামার ইত্যাদি।

এখন আমরা এইসব চরিত্রদের মুখের ভাষা ব্যবহার দেখে বোঝার চেষ্টা করবো এই সব চরিত্রগুলির কথা বলার ধরণ কিরকম। আমার বোঝার চেষ্টা করবো এই সব চরিত্রদের মনোভাব।

প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষের ব্যবহৃত মুখের ভাষা:

১) মালী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'আনন্দ'। উদা: "মহারাজ, নিত্যপূজার ফুল পাই না, আজ যে, পাঁশগাদার উপরে, সাত চাঁপা এক পারুল গাছে, টুলটুলে সাত চাঁপা আর এক পারুল ফুটিয়া রহিয়াছে"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সাত ভাই চম্পা, পৃ: ৭১)

২) জহ্লাদ যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়সূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে তা হল 'স্নেহ'। উদা: "রাজপুত্র! রাজার আজ্ঞা, কি করিব – কোলে কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছি, সেই সোনার অঙ্গে আজ কিনা খড়্গ ছোঁয়াইতে হইবে!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৭৭)

৩) নাপিত যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রগুলির সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রার্থনাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'ক্ষমা' চাওয়ার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। উদা: "দাদা! বড় চুক হইয়া গিয়াছে, মাফ কর ভাই, নইলে গরিব মানুষ প্রাণে মারা যাই"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শিয়াল পণ্ডিত, পৃ: ১৮৩)

৪) কুমোর যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রগুলির সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রার্থনাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'ক্ষমা' চাওয়ার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। উদা: "এখন কি করি ভাই, মাফ না করিলে যে গরিব মারা যায়!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শিয়াল পণ্ডিত, পৃ: ১৮৪)

৫) কাঠুরিয়া যখন তার বউয়ের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একইসঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কাঠুরিয়ার 'রাগ'এর মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "ও সর্বনাশি!" – শশা তো খাইয়াছে! –"আ অভাগী কুলোকানি! – করেছিস কি রাক্ষাসি! – খেলি তো খেলি, বোঁটা কেন ফেললি! শীগগির তুলে খা!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, দেড় আঙুলে, পৃ: ২০৯)

৬) বেয়ারা যখন বুড়ির সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'আদেশ বা নির্দেশ' মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "বুড়ি, ঘরে যা, মেয়ের দেখা পাবি না। ও যাচ্ছে গহন বনে – যা ছিল ওর বাপের মনে"। (রাঙাদির রূপকথা, রাজপুত্তুর সবুর, পৃ: ২৪)

৭) দোকানি যখন বুড়ির সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে দোকানির 'বিরক্তি' মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: "দূর হ বুড়ি, চলে যা, পাঁচ কড়ার খই মেলে না"। (রাঙাদির রূপকথা, রাজপুত্তুর সবুর, পৃ: ২৫)

৮) সরাইওয়ালা যখন বামুনের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে সরাইওয়ালার 'আধিপত্য' মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: "চোর কোথাকার! চালাকি করবার জায়গা পাওনি, না? বেরোও বলছি!" (বাংলার উপকথা, গরিব ব্রাহ্মণের কথা, পৃ: ৫৯)

৯) বামুন যখন সরাইওয়ালার সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে বামুনের 'অসহায়' মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: "তুমি আমার হাঁড়ি বদলেছ!" (বাংলার উপকথা, গরিব ব্রাহ্মণের কথা, পৃ: ৫৯)

১০) সাধু যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে সাধুর 'অনুরোধ' মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। উদা: "মহারাজ, আপনার মনের দুঃখ আমি জানতে পেরেছি। রাজধানীর উত্তরে যে বিশাল ঘন বন আছে, তার ঠিক মধ্যিখানে এক আমগাছ আছে। এত বড় আমগাছ সচরাচর দেখা যায় না। ঐ আমগাছের ডালে সাতটি পাকা আম ঝুলে আছে। মহারাজ যদি ঐ বনে গিয়ে নিজের হাতে ঐ সাতটি আম পেড়ে এনে রাণীদের খেতে দেন, তাহলে তাদের প্রত্যেকের ছেলে হবে"। (বাংলার উপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ১৩১)

১১) প্রজা যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রজার 'অনুরোধ' মনোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। উদা: "মহারাজ, রোজ সন্ধ্যায় রাজবাড়ির দিক থেকে এক আকাশ জোড়া প্রকাণ্ড বাজপাখি উড়ে এসে রাজপথ থেকে মানুষ তুলে খায়। অনেক দিন ধরে এই সর্বনাশ চলছে, মহারাজ শহর ক্রমে শ্মশান হচ্ছে যা বিহিত হয়, তাই হুকুম করুন"। (বাংলার উপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ১৩৭)

১২) প্রজারা যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রজাদের 'অসহায়' মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "ধর্মাবতার! চোর

ডাকাতের জ্বালায় এ রাজ্যে টেকা দায় হয়ে উঠেছে। আমাদের সামান্য যা সম্পত্তি, তাও রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আপনার কাছে এসেছি, যেমন করে হোক, চোর ডাকাতের ধরে তাদের উপযুক্ত সাজা দিন"। (বাংলার উপকথা, আগে কথা পরে কাজ, পৃ: ১৪৯)

১৩) ব্যাধ যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "তা বলে, মহারাজ। ওকেই ওর দাম জিজ্ঞাসা করুন"। (বাংলার উপকথা, হীরেমনের গল্প, পৃ: ২০৯)

১৪) ব্যাধের বউ যখন ব্যাধের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে ব্যাধ বউয়ের 'দয়া' মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "হ্যাঁ গো, এতটুকু পাখি মেরে কি লাভ? ওর কতটুকুই বা মাংস। ওকে না মারলেই ভালো"। (বাংলার উপকথা, হীরেমনের গল্প, পৃ: ২০৯)

১৫) তাঁতি যখন মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রদের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে তাঁতির 'অবাক' মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: "কি যে বল ভাই। আমি হব রাজার জামাই। যেদিন পশ্চিমে সূর্য উঠবে, সেদিন আমি রাজার জামাই হব"। (বাংলার উপকথা, শেয়াল ঘটক, পৃ: ২২৪)

১৬) কুমোর বউ যখন কুমোরের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কুমোর বউয়ের 'দিশেহারা' মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: "ওগো, বড় বেলা করে ফেলেছি যে। একেবারে সকাল হয়ে এল, এখন হাঁড়ি-কুড়িতে আঁচ দেবার সময় কোথায়?" (বাংলার উপকথা, চাঁদের কপালে চাঁদ, পৃ: ২৩৯)

১৭) কুমোর যখন তার বউয়ের সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কুমোরের 'অনুরোধ' মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: "ওগো, যে পথে পৃথিবীর সকলে যায় আমিও সেই পথে চলেছি। তবে তোমাদের খাওয়া পরার জন্য

আমি যথেষ্ট রেখে যাচ্ছি। সাবধানে থেকো আর ছেলে-মেয়ের যত্ন কর"। (বাংলার উপকথা, চাঁদের কপালে চাঁদ, পৃ: ২৪১)

১৮) নাপিত যখন ভূতের সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে নাপিতের 'আদেশ বা নির্দেশ' মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: "বেশ, তাহলে এক্ষুনি আমাকে এক হাজার সোনার মোহর এনে দে। আর কাল রাতের মধ্যে আমার বাড়িতে মস্ত এক গোলা তৈরি করে, ধান দিয়ে ভরে রাখিস। আগে আমার মোহরগুলো আন তো দেখি, নইলে থলিতে ভরব"। (বাংলার উপকথা, ভীতু ভূত, পৃ: ২৫২)

সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা তৃতীয় যে ভাগটা করেছি সেটার নাম 'রাক্ষস খোক্কস এবং তার সমগোত্রীয় চরিত্রের ভাষা' এই চরিত্রগুলি আসলে রাজার বিপ্রতীপে থাকা বিরুদ্ধতাবাদী শ্রেণি। এরা অন্ত্যজ। আবহমানকাল ধরে এদেরকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কোন সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হয়নি। আমরা এখন এদের ভাষা ব্যবহার এবং মনোভাব দেখার চেষ্টা করবো।

রাক্ষস খোক্কস এবং তার সমগোত্রীয় চরিত্রের ভাষা:

১) রাক্ষস যখন রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে কথা বলছে সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একইসঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ারও ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে

রাক্ষসের ‘ক্রোধ’ মনোভাবের প্রকাশ হয়েছে। উদা: “হাঁউ মাউ কাউ!/সাত শত্তুর খাউ!! –” (ঠাকুরমা’র ঝুলি, নীলকমল আর লালকমল, পৃ: ১৩৪)

২) রাক্ষসী রাণী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রার্থণাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাক্ষসীর ‘রাগ’ মনোভাব প্রকাশিত। উদা: “সাত সতিনের সাত জোড়া চোখ আগে চাই, তারপর সাত-সাতটা মাথা কেটে সাত খর্পর রক্ত চাই”। (রাঙাদির রূপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ৯)

৩) রাক্ষসী রাণী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাক্ষসী রাণীর যে মনোভাব প্রকাশিত তা হল ‘ছলনা’। উদা: “মহারাজ, আমার কলজের ব্যামো। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না। এক যদি তুমি তোমার ঐ চালাক চাকরটাকে সমুদ্রে অন্য পারে পাঠিয়ে, আমার বুড়ি মায়ের কাছ থেকে, ওদের দেশের বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি আনিয়ে দিতে পার, তবেই আমি ভালো হব।” (বাংলার উপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ১৩৫)

৪) রাক্ষসী রাণী যখন রাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাক্ষসী রাণীর ‘ছলনা’ মনোভাব প্রকাশিত। উদা: “ওষুধে তো কিছু হইবে না, বনের সেই আমগাছ কাটিয়া তাহার তক্তার ধোঁয়া ঘরে দিলে তবে আমার ব্যারাম সারিবে।” (ঠাকুরমা’র ঝুলি, সোনার কাটি রূপার কাটি, পৃ: ১৬৫)

৫) বেক্ষদত্যি যখন ব্রাক্ষণের সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একইসঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ারও ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে বেক্ষদত্যির ‘দয়ালু’ মনোভাব প্রকাশিত। উদা: “তা বন্ধু, পাড়ায় পাড়ায় যাও, চেয়েচিন্তে একশো কাস্তে নিয়ে এসে এইখানে রেখে যাও। ধান কাটা, ঝাড়া, মাড়া, ঝাড়া-ধান গোলায় ভরা, মড়াই

করা, খড় বিচালি পালুই করা – সব হবে। তুমি শুধু কাস্তেগুলি রেখে দিয়ে খামারের জায়গা ঠিক করোগে"। (রাঙাদির রূপকথা, বেক্ষদত্যি, পৃ: ৪২)

৬) রাক্ষসী যখন বামুনের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাক্ষসীর 'ছলনা' মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "এসো, এসো গো! এতদিন পরে দাসীকে মনে পড়লো?" (বাংলার উপকথা, রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৬৫)

৭) রাক্ষসী যখন বামনীর সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাক্ষসীর 'কলহ করার' মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "আমাকে বলা কেন? আমি কি কাঁচা মাংস খাই?" (বাংলার উপকথা, রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৭০)

৮) রাক্ষসী যখন রাণীর সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাক্ষসীর 'ঘৃণা' মনোভাব প্রকাশিত। উদা: "মা আমি আর রাজবাড়িতে কাজ করতে পারছি না"। (বাংলার উপকথা, রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৭৮)

সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা চতুর্থ অর্থাৎ শেষ যে ভাগটি করেছি তা হল 'মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রদের ভাষা'। এই বিভাগের চরিত্রদের মধ্যে আমরা যেমন পশু-পাখি পাবো তেমনভাবে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদের ও পাবো। আমরা এই বিভাগে অনেক 'সর্বজ্ঞ কথক' চরিত্রদেরও পাবো। এইসব চরিত্রদের মুখের ভাষার উপর নির্ভর করে কথা বলার ধরণ বোঝার চেষ্টা করবো। বোঝার চেষ্টা করবো মনোভাব। আমরা এই বিভাগে কি কি চরিত্র পাচ্ছি তা প্রথমে দেখে নেব। এখানে আমরা পাবো – কুকুর, পাখি, তুলসীগাছ, ষাড়, কলাগাছ, তুলোগাছ, ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী, বাছুর, ইঁদুর, বেড়াল, বাঁদর, বুনো শুয়র, বটগাছ, বুদ্ধু, ভূতুম, ফুল, বাতাস, গাই, শেওড়াগাছ, ঘোড়া, ব্যাঙ, সাতনলা ও খোলস ইত্যাদি।

মনুষ্য ব্যতিরেকে চরিত্রদের মুখের ভাষা:

১) পাখি(টিয়া) যখন রাজকন্যার সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "রাজকন্যা, রাজকন্যা, কিসের গরব কর; - / শতেক নহর হীরার হার গলায় না পর!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৮৪)

২) শুক সারী যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'স্নেহ' মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "আহা বাছা, পারিবি?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৮৬)

৩) পদ্ম(ফুল) যখন রাজপুত্রের সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "মাথে রাখ গজমোতি, সোনার কমল বুকে/ রাজকন্যা রূপবতী ঘর করুক সুখে"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শীত বসন্ত, পৃ: ৮৮)

৪) কুমির যখন শিয়ালের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কুমিরের 'ইচ্ছা' মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই, দেখি, দেখি, ছেলেরা আমার কেমন লেখাপড়া শিখিয়াছে"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শিয়াল পণ্ডিত, পৃ: ১৭৮)

৫) কুমির যখন কুমীরানীর সাথে কথা বলছে, সেখানে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'অনুরোধ' মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "ওগো, ইলিশ-খলিসের চচ্চড়ি, রুই-কাতলার গড়গড়ি, চিতল-বোয়ালের মড়মড়ি সব তৈয়ার করিয়া রাখ, ছেলেরা আসিয়া খাইবে"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, শিয়াল পণ্ডিত, পৃ: ১৭৮)

৬) বাতাস যখন দুখুর সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "দুখু কাঁদিস নে, আমার সঙ্গে আয়, তোকে তূলা দেব"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সুখু আর দুখু, পৃ: ১৮৯)

৭) গাই যখন দুখুর সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নবোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'অনুরোধ' মনোভাবের প্রকাশিত হয়েছে। উদা: "দুখু কোথা যাচ্ছ – আমার গোয়ালটা কাড়িয়া দিয়া যাবে?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সুখু আর দুখু, পৃ: ১৮৯)

৮) কলাগাছ যখন দুখুর সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কলাগাছের 'অনুরোধ' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। উদা: "দুখু, কোথা যাচ্ছ – আমায় বড় লতাপাতায় ঘিরিয়াছে, এগুলিকে টেনে দিয়ে যাবে?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সুখু আর দুখু, পৃ: ১৮৯)

৯) সেওড়াগাছ যখন দুখুর সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'আনুরোধ' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। উদা: "দুখু, কোথা যাচ্ছ – আমার গুঁড়িটায় বড় জঞ্জাল, ঝাড় দিয়া যাবে?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সুখু আর দুখু, পৃ: ১৮৯)

১০) ঘোড়া যখন দুখুর সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে 'অনুরোধ' মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। উদা: "দুখু, দুখু, কোথা যাচ্ছ, - আমাকে চার গোছা ঘাস দিয়া যাবে?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, সুখু আর দুখু, পৃ: ১৮৯)

১১) ব্যাঙ যখন দেড় আঙুলের সাথে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "ভাই, এত করিলে অত করিলে, সব মিছা!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, দেড় আঙুলে, পৃ: ২১৫)

১২) বটগাছ যখন বুড়ি বা মেয়ের সাথে কথা বলছে, সেখানে নির্দেশাত্মক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "সরোবরে নেয়ে এসে আধেক খই দুজনে খাও, আর আধেক খই সরোবরের চারি পাড়ে ছড়িয়ে দাও"। (রাঙাদির রূপকথা, রাজপুত্তুর সবুর, পৃ: ২৫)

১৩) তুলসীগাছ যখন কথা বলছে, সেখানে প্রার্থনাসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "যাও মা, সুখে শান্তিতে বাস কর। তোমার স্বামী তোমাকে ভালোবাসবে"। (বাংলার উপকথা, টেকো বৌ, পৃ: ২৭০)

১৪) সোনার পাখি যখন মহারাজার সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "মহারাজ, এসব যদি মানুষে খাইতে না পারে, তো মানুষের পেটে কাঠের পুতুল কেমন করিয়া হয়?" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, কিরণমালা, পৃ: ১১৫)

১৫) ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, সেখানে বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "আহা; এমন দয়াল কাঁরা, দুফোঁটা রক্ত দিয়া আমার বাছাদের চোখ ফুটায়!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, নীলকমল আর লালকমল, পৃ: ১২৯)

১৬) ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাচ্চারা যখন রাজপুত্রদের সাথে কথা বলছে, সেখানে প্রশ্নসূচক বাক্যের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উদা: "কে তোমরা রাজপুত্র আমাদের চোখ ফুটাইয়াছ? আমরা তোমাদের কি কাজ করিব বল"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, নীলকমল আর লালকমল, পৃ: ১২৯)

সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে যে শ্রেণিবিভাগ আমরা করেছিলাম সেই শ্রেণিবিভাগের আলাদা আলাদা চরিত্রের যে মুখের ভাষা এবং যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা আমরা দেখানোর চেষ্টা করলাম। এত চরিত্রের যে আলাদা আলাদা মুখের ভাষা এবং মনোভাব এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি তার থেকে এটা পরিস্কার যে সব চরিত্র একইরকম ভাবে কথা বলছে না। যে মনোভাব ফুটে উঠেছে তাও একইরকম নয়। মনোভাবের মধ্যেও পার্থক্য ধরা পড়েছে। আমরা

দেখতে পেয়েছি রাজা এবং তার চারপাশের লোকজন যে ভাবে কথা বলছে সেখানে আদেশ, নির্দেশ, হুমকি প্রভৃতি মনোভাব ধরা পড়েছে। প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষজনের ভাষা ব্যবহারের মধ্যে আনুগত্য, ক্ষমা প্রভৃতি মনোভাব, একইরকমভাবে রাক্ষসের ভাষার মধ্যে রাগ, ক্রোধ প্রভৃতি মনোভাব। সমাজ যে তাদেরকে জায়গা দেয় না, তাদের পরিচিতি কে যে অস্বীকার করা হয় তা তাদের কথার মধ্যে ধরা পড়েছে। রাক্ষসের সমগোত্রীয় চরিত্রগুলো যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে গরিব মানুষের কাছে আশীর্বাদ হিসাবে ধরা দিয়েছে, তেমনভাবে সমাজের উপরে থাকা মানুষজন যেমন রাজা, রাজপুত্রদের জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমাজের উপরে থাকা মানুষজনের প্রতি যে রাগ, সে রাগ তাদের কথার মধ্যে ধরা পড়েছে। আমরা দেখতে পাবো অনেক গল্পে রাজা, রাজপুত্রকে মারার জন্য ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে রাক্ষসীরা। রাক্ষসী হয়েও মানুষরূপে রাজার কাছে আসার চেষ্টা করেছে, রাজার মন জয় করে রাজপুরীতে রাণী হয়ে এসেছে। রাজার অন্য রাণীর সাথে কলহ করেছে, রাজাকে দিয়ে রাজপুত্রকে দূর দেশে পাঠিয়ে রাক্ষসী সমাজে তার অবস্থান প্রমাণ করতে চাইলেও পরবর্তীতে তাদের সেই চেষ্টা সফলতা পায়নি। হয় রাজা, নাহলে রাজপুত্রদের হাতে তাদের বেঘোরে মরতে হয়েছে। আসলে গল্পগুলিতে রাক্ষসীদের যা কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে তা কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা হিসাবে আমরা ধরতে পারি। সমাজ তাদেরকে কোনোদিন জায়গা দেয়নি, এই না দেওয়া জায়গাটাকে ফিরে পেতে চেয়েছে গল্পগুলিতে ব্যবহৃত হওয়া এই চরিত্রগুলি। মনুষ্য ব্যতিরেকে যে চরিত্রগুলি এখানে উল্লিখিত হয়েছে, এরা আসলে রাজা, রাজপুত্র, কাজকন্যার ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ঝোঁকের বশে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি ধরিয়ে দিয়ে আবার সবাইকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে এইসব চরিত্রগুলো। গল্পের শুরু থেকে শেষ সবটাই জানা এই বিভাগে থাকা কিছু কিছু চরিত্রের। তাই সমস্যার সমাধান কিভাবে, কোন পথে তা তারা বলে গল্পকে সমাধানের দিকে এগোতে সাহায্য করেছে। এই যে বিভিন্ন বিভাগের

চরিত্রদের কথা বলার ধরণ আলাদা বা মনোভাব আলাদা, তার কারণ হিসাবে সামাজিক মর্যাদা, পেশা, শিক্ষা বিষয়গুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

লিঙ্গের ভিত্তিতে আমরা যে শ্রেণিবিভাগ করেছিলাম সেখানে আমরা, তিনটি সংকলনে ব্যবহৃত হওয়া চরিত্রগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলাম। একদিকে রেখেছিলাম 'পুরুষের ভাষা'। অন্যদিকে রেখেছিলাম 'মহিলাদের ভাষা'। আমরা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করার সময় দেখেছি পুরুষেরা কথা বলার সময় তাদের মধ্যে আদেশ, নির্দেশ, আধিপত্য, দমিয়ে রাখার মানসিকতা, সাহসিকতা, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ধরা পড়েছে। অন্যদিকে মহিলারা কথা বলার সময় আবেদন, নিবেদন, আত্মসমর্পণ, অনুরোধ মনোভাব ধরা পড়েছে। আমরা দেখেছি রাজকন্যা যেভাবে কথা বলে, দাসী সেভাবে কথা বলে না। দুজনের কথা বলার মনোভাবও আলাদা আলাদা। মেয়েদের কথা বলার মধ্যে একটু 'মেয়েলি' ভাব ধরা পড়েছে। শব্দ ব্যবহারেও আছে মেয়েলি ধরণ। কোন শব্দ মেয়েলি তা নির্ধারণ করে সমাজ। সমাজ যেগুলোকে মেয়েলি শব্দ বলে দেগে দিয়েছে সেগুলির ব্যবহার এই তিনটি সংকলনে ব্যবহৃত হওয়া মহিলাদের থেকে আমরা পাচ্ছি।

লিঙ্গের ভিত্তিতে, সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা এই যে ভাগ করার চেষ্টা করা হল এবং ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য, মনোভাবে পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হল এগুলো শিশুর শৈশব নির্মাণে কি ভূমিকা গ্রহণ করছে? আদৌ কোন ভূমিকা গ্রহণ করছে কিনা তা আমরা এখন বলার চেষ্টা করবো।

ক) সমাজ সম্পর্কে শিশু অজ্ঞ। সমাজ বলতে শিশু বোঝে সে নিজে এবং তার পরিবারের লোকজন। এটাই শিশুর চেনা জগত। এর বাইরে যে আর কিছু আছে বা থাকতে পারে তা শিশুর স্বাভাবিক বোধের মধ্যে থাকে না। তাই শিশুর কাছে এটা পরিচিত করানোর প্রয়োজন আছে যে সমাজের বিস্তৃতি কতটা। সমাজ শুধু সেই শিশু এবং তার চারপাশে থাকা

মানুষগুলিকে নিয়ে নয়। এর বাইরে আরও অনেকে আছে। তারাও সমাজের অংশ। এদের অবস্থিতি শিশুর কাছে বিশ্বাসযোগ্য করানো। এদের ভাষাও যে বাংলা ভাষা তা শিশুর কাছে পরিচিত করানো। এরা যে ভাষায় কথা বলে সেটাও যে একপ্রকার বাংলা ভাষা তা শিশুকে জানানো। শিশু যখন এই কাহিনীগুলি পড়বে বা শুনবে তখন তারা যেন এটা মনে করতে পারে এত অপরিচিত চরিত্র তার চেনা জগতের বাইরে আছে। মূল কথা হল শিশুকে সমাজ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া। শিশুর ভাবনা-চিন্তার যে পরিধি তার পরিবর্তন আসলে এই সংকলনগুলোর মধ্য দিয়েই হচ্ছে। শিশুকে বৃহৎ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে এই সংকলনগুলোর এত এত চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

খ) কলোনির শিক্ষানীতি অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি বলতে আমাদের যা জানাবোঝা তা থেকে এটা আমাদের সবার কাছে পরিষ্কার যে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সবাইকে ইংরাজিতেই শিক্ষা দিতে হবে। পাশাপাশি যতটুকু দরকার ততটুকুই বাংলা শিক্ষা দেওয়া হবে। মাতৃভাষা ভুলিয়ে একেবারে নতুন একটা অপরিচিত ভাষা হবে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। এই সংকলনগুলির এত এত চরিত্রের আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহার, তাদের শ্রেণিবিন্যাস শিশুর কাছে পরিচিত করানো হচ্ছে তা আসলে কলোনির শিক্ষানীতির বিপ্রতীপে এক ধরণের জাতীয়তাবাদী অ্যাপ্রোচ। অর্থাৎ আমাদের যে জাতীয় সম্পত্তি তাকে উৎখনন করে সবার সামনে তুলে নিয়ে আসা। এতদিন ধরে যা চাপা পড়েছিল তাকে কর্ষণ করে উপরে তুলে আনার চেষ্টা এই রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলির মধ্যে আছে। ‘কেন্দ্র’ এবং ‘প্রান্ত’ অবস্থান সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা শিশুর কাছে পৌছানোর জন্য এত আলাদা আলাদা সমাজোপভাষার ব্যবহার করা হয়েছে।

গ) এই ধরণের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিশুর কাছে জানান দেবার দুটো আলাদা উদ্দেশ্য আছে। এই যে রাক্ষসের ভাষা, সবার ভাষার থেকে একেবারেই আলাদা এগুলো ব্যবহার করার উদ্দেশ্য

হিসাবে আমরা বলতে পারি শিশুকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শিশুর মনের মধ্যে ভয় নামক বোধের জন্ম দেওয়া হচ্ছে। এটা বাইরের উদ্দেশ্য। গল্পগুলো পড়লে এ উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। এর বাইরেও একটা উদ্দেশ্য আছে। যেটা আসলে লুকানো। শিশু যখন ছোটো থেকে বড় হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই ধরণের ভাষাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। যে শিশু এই ধরণের ভাষাগুলি নিয়ে সচেতন তার কাছে এই ধরণের ভাষাগুলি অন্যান্য সামাজিক শ্রেণিগুলো সম্বন্ধে চেতনার বোধ তৈরি করছে। প্রশ্ন তোলা যায় এই যে চেতনার বোধ তৈরি করা হচ্ছে এটা কি যথার্থ? কোথাও তো রাক্ষস কে ভালো দেখানো হচ্ছে না। চেতনার বোধ যথার্থ না হলেও, রাক্ষসকে যতই খারাপ করে দেখানো হোক না কেন, রাক্ষসের যে অবস্থান আছে, সেই অবস্থান সম্বন্ধে শিশুকে জানান দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীকালে শিশু 'মেঘনাদবধ'এ গিয়ে বুঝে নিতে পারে রাক্ষস কি। কেমন তার প্রকৃতি। তারা ঠিক কতটা খারাপ। আসলে রাক্ষসের অবস্থান সম্বন্ধে ভিতটা তৈরি করছে এই রূপকথা-উপকথার সংকলন।

আসলে এই সংকলনগুলির মাধ্যমে এত এত অজানা চরিত্র, তাদের মুখের ভাষা সম্বন্ধে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্য হল শৈশবকে সার্বিকভাবে নির্মাণের একটা প্রচেষ্টা। উপনিবেশে বসবাসকারী শিক্ষিত, উচ্চবর্গ, উচ্চবিত্ত মানুষজন শৈশবকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক শিক্ষার পাশাপাশি রূপকথা-উপকথাকেও জায়গা দিচ্ছে। নির্মিত হবার পথে আরো একধাপ এগিয়ে যাচ্ছে শিশুর শৈশব।

উল্লেখপঞ্জি

১। পবিত্র সরকার, *ভাষা দেশ কাল*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অগ্রহায়ণ ১৪২২, পৃ. ৩

২। তদেব, পৃ. ৫

৩। Marx, Karl., *The German Ideology*, Moscow, 1964, p. 161

৪। ibid, p. 168

৫। পবিত্র সরকার, *ভাষা দেশ কাল*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অগ্রহায়ণ ১৪২২, পৃ. ৬

৬। তদেব, পৃ. ৭

৭। তদেব, পৃ. ১৭

৮। ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ড. নীলিমা চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৪

৯। https://www.goodreads.com/author/quotes/297261.Leonard_Bloomfield dt. 12/03/2019, time- 12:30 a.m.

১০। https://www.goodreads.com/author/quotes/78968.Peter_Trudgill dt.12/03/2019, time- 12.32 a.m.

১১। পবিত্র সরকার, *ভাষা দেশ কাল*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অগ্রহায়ণ ১৪২২, পৃ. ৯

১২। ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, ড. নীলিমা চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২৪৬

১৩। Trudgill, Peter., *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*, England, Penguin Books, p.122

১৪। মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, কলকাতা, নয়া উদ্দ্যোগ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৫১-১৫৩

১৫। তদেব, পৃ. ১৫৩-১৫৪

১৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ‘বর্ণপরিচয়’, দ্বিতীয় ভাগ, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ*, আশিস খাস্তগীর (সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৮৭

১৭। স্বামী বিবেকানন্দ, ‘বাঙ্গালা ভাষা’, “ভাববার কথা”, *বিবেকানন্দ সমগ্র*, ১ম খণ্ড, কাঞ্চন বসু(সম্পাদিত), কলকাতা, রিফ্লেক্ট পাব্‌লিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ১৩৮

১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ‘বর্ণপরিচয়’, দ্বিতীয় ভাগ, *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ*, আশিস খাস্তগীর (সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৮৬

১৯। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ‘কিরণমালা’, *ঠাকুরমা’র ঝুলি*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৬

২০। তদেব, পৃ. ৯৬

২১। তদেব, পৃ. ৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

রূপকথা-উপকথা এবং বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণ: সংকলনগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম রূপকথা-উপকথার গল্পগুলির সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম উল্লিখিত সংকলনের গল্পগুলির চরিত্রদের মুখের ভাষা এবং ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মনোভাব শিশুর কাছে আলাদা কোনো গুরুত্ব তৈরি করতে পারছে কিনা। সর্বোপরি আমরা খুঁজে দেখতে চেয়েছিলাম, শিশুর শৈশব নির্মাণে চরিত্রদের মুখের ভাষার ভূমিকা। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় "রূপকথা-উপকথা এবং বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণঃ নির্বাচিত সংকলনগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা" অর্থাৎ এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করবো, উল্লিখিত শিরোনামে যে বাঙালির শৈশবের কথা বলা হচ্ছে, এই বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণে রূপকথা-উপকথার ভূমিকা কি? আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো, উল্লিখিত শিরোনামে যে বাঙালির কথা বলা হচ্ছে, সেই বাঙালি বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে? আমরা বলার চেষ্টা করবো, আমরা যে তিনটি রূপকথা-উপকথার সংকলনকে নির্বাচন করেছি, সেই সংকলনগুলির গল্পগুলির মধ্যে শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণের কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে কিনা? সর্বোপরি আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো, নির্বাচিত বইগুলির রচনার প্রেক্ষাপট এবং সেইসঙ্গে তিনটি সংকলনের রচনার সময়কালের মধ্যের যে সময় সেই মধ্যবর্তী সময়ে শৈশবের আইডেন্টিটির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তাও আমাদের আলোচনার মধ্যে থাকবে।

এই অধ্যায় নিয়ে কথা শুরু করতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি তৈরি হয় তা হল বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে কিভাবে? শৈশবের আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে কিভাবে তা নিয়ে কথা শুরু করার আগে আমাদের জেনে নিতে হবে আইডেন্টিটি আসলে কি? আইডেন্টিটি তৈরি হয় কিভাবে? কতরকমভাবে আইডেন্টিটির ধারণা তৈরি হয় তা জেনে নেবার পর আমরা আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করবো।

আইডেন্টিটি কথাটির বাংলা অর্থ পরিচিতি সত্তা বা ব্যক্তিগত পরিচয়। একজন মানুষকে চেনার জন্য সেই মানুষের যা যা কিছু বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সেই মানুষের আইডেন্টিটি বা ব্যক্তিগত পরিচয়। যদি একজন ভারতীয় নাগরিকের পরিচয় পত্র অর্থাৎ ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড দেখা হয় তাহলে সেখানে আমরা দেখতে পাবো সেই কার্ডে সেই ব্যক্তিটির নাম, বাবার নাম, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদি পরিচয়গুলি উল্লিখিত থাকে। এই পরিচয়গুলিই আসলে ব্যক্তিটিকে চেনার মাধ্যম। এগুলি তার প্রাথমিক আইডেন্টিটি। এই পরিচয়গুলির মাধ্যমেই আমরা সেই ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির থেকে আলাদা করতে পারি। আসলে আইডেন্টিটি হল স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় 'তুমি কে?' তুমি কে এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের সম্বন্ধে সে যা কিছু বলবে সেগুলি সেই ব্যক্তির আইডেন্টিটি বা পরিচয় চিহ্ন বলে গন্য হবে। আইডেন্টিটি বা পরিচিতি সত্তার কথা বলতে গেলে আরো দুটি কথা আমাদের মাথায় আসে। চিহ্নক (signifier) এবং চিহ্নিত (signified). চিহ্নক বা signifier বলতে আমরা বুঝি, যে বৈশিষ্ট্যগুলি একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর থেকে আলাদা করে। অন্যদিকে চিহ্নিত বা signified বলতে বুঝি চিহ্নক বা signifier দ্বারা নির্মিত সেই বস্তু। আইডেন্টিটি মূলত চিহ্নক (signifier) এবং চিহ্নিত (signified) এর খেলা। চিহ্নক (signifier) এবং চিহ্নিত (signified) এর যৌথতায় আসলে আইডেন্টিটি গড়ে ওঠে। 'তুমি কে' এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো ব্যক্তি তার যে যে পরিচিতির কথা বলবে, সেগুলি চিহ্নক বা signifier. এবং এই চিহ্নগুলির দ্বারা যে 'তুমি' প্রকাশিত হল, তা চিহ্নক বা signified.

আইডেন্টিটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Oxford Dictionary বলছে –

"The fact of being who or what a person or thing is, a close similarity or affinity, a transformation that leaves an object unchang"[১].

একইরকমভাবে আইডেন্টিটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Cambridge English Dictionary বলছে

"Who a person is, or the qualities of a person or group that make them different from others"[২].

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কে বা এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গুণাবলী যা তাদের বা তাকে অন্যের থেকে আলাদা করে তোলে।

একজন ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচিতির মাধ্যমে সমাজে পরিচিতি পায়। আসলে আইডেন্টিটি হল –

"Who you are, the way you think about yourself, the way you are viewed by the world and the characteristics that define you"[৩].

একজন মানুষের পরিচিতি সত্তার নির্মাণ বিভিন্ন রকমভাবে হতে পারে। এটা আমাদের সকলের জানাবোঝার মধ্যে আছে যে একজন মানুষ যখন ছোটো থেকে বড়ো হয় তখন বয়সের সাথে সাথে তার আইডেন্টিটি পরিবর্তিত হতে হতে যায়। অর্থাৎ বয়স যত বাড়বে তত নতুন নতুন আইডেন্টিটি তার সঙ্গে যুক্ত হবে। ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে আসলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন আইডেন্টিটি মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়। যত বেশি মানুষের সঙ্গে কথা বলবে, যত ধরণের মানুষের সাথে কথা বলবে তত নতুন নতুন আইডেন্টিটি মানুষের সঙ্গে যুক্ত হবে। সঙ্গে একথাও বলা যায় যে আইডেন্টিটি কেবল যুক্ত হয়, এরকমটা নয়। আইডেন্টিটি সময়ের সাথে সাথে খসেও যায়। সময় যত এগোবে তত বেশি করে পুরনো আইডেন্টিটি খসে পড়বে এবং নতুন আইডেন্টিটি যুক্ত হবে। একটা শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার একটা নাম থাকে। সেই নাম ঐ শিশুর প্রথম আইডেন্টিটি। পরবর্তীতে যখন সে বড় হবে তখন সে যে স্কুলে পড়তে যাবে সেই স্কুলটাও তার একটা আইডেন্টিটি। ক্রমে তার মধ্যে লিঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা, ধর্ম সংক্রান্ত ধারণা, পেশাগত ধারণার বিকাশ হবে। এগুলিও আইডেন্টিটি। সময়ের

সাথে একজন মানুষের মধ্যে যে যে আইডেন্টিটি যুক্ত হয় সেগুলিকে যদি আমরা ক্রমানুসারে সাজাই তাহলে দেখবো তার মধ্যে –

১) সামাজিক পরিচিতি (Cultural Identity)

২) পেশাগত পরিচিতি (Professional Identity)

৩) জাতিগত এবং জাতি পরিচিতি (Ethnic and National Identity)

৪) ধর্মীয় পরিচিতি (Religious Identity)

৫) লিঙ্গগত পরিচিতি (Gender Identity)

৬) অক্ষমতাগত পরিচিতি (Disability Identity) ইত্যাদি পরিচিতিগুলি যুক্ত হয়।

নির্মাণ অর্থে তৈরি করা। কোনো নির্মাণই একদিনের নয়। দীর্ঘ উত্তরণ ও অবতরণের মধ্য দিয়ে যে কোনো কিছুর নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। পরিচিতি সত্তার নির্মাণও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। সময়ের সাথে সাথে একজন ব্যক্তি, সমাজে পরিচিতির ধারণা বদল করতে করতে যায় বা বলা যায় নির্মাণ করতে করতে যায়। জন্মানোর পর থেকেই নানা পরিচিতি একজন মানুষের কাছে ভিড় করে আসে। প্রথমে আসে বাবা-মার পরিচিতি। তারপর আসে তাদের দেওয়া নাম। সেটাও পরিচিতি। পরবর্তীকালে 'ধর্ম' নামক পরিচিতি তার সাথে যুক্ত হয়। এরপর যত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তত নতুন পরিচিতি যুক্ত হবে। কখনো সে ছাত্র, কখনো সে চাকুরীজীবী। কারুর আবার পরিচিতি কৃষক বলে। আসলে কোনো নির্মাণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয় না। তাকে নির্মাণ করতে হয়। অর্থাৎ কোনো একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে কৃষক বলে চিহ্নিত করে তবেই সমাজ তাকে কৃষক বলে চিনবে। একইরকমভাবে কোনো একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে হিন্দু বলে চিনতে চায় তাহলে সমাজ তাকে হিন্দু বলেই চিনবে। এভাবেই আসলে একজন মানুষ

নিজেকে পরিচিত করায় সমাজের কাছে। একইরকমভাবে সমাজ এই পরিচিতিগুলিকে মান্যতা দিয়ে ব্যক্তির পরিচয়কে প্রকাশ করে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম শৈশব কি। বাঙালির শৈশব কি তাও আমরা বলার চেষ্টা করেছিলাম। উনিশ শতকের আগে শৈশব নামক ধারণার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে কিনা, বাঙালির শৈশব কি আলাদা কোনো বিষয়, শৈশব কি কলোনি নির্মিত, শৈশবের চিহ্নগুলি কি ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম। এখানে আমরা বলতে চাইছি যে বাঙালির শৈশবের কথা বলা হচ্ছে সেই শৈশবের আইডেন্টিটির নির্মাণ হচ্ছে কিভাবে। শৈশবের যে চিহ্নগুলির কথা বলা হয়েছিল, আইডেন্টিটির নির্মাণের সঙ্গে এই চিহ্নগুলির সম্পর্ক কি?

'শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণ' কথাটির মধ্যে একইসাথে দুটি কথা লুকিয়ে আছে। প্রথম কথাটি হল 'শৈশব'। দ্বিতীয় কথাটি হল 'শৈশবের আইডেন্টিটি'। একটু যদি ভালো করে খেয়াল করা যায় তাহলে বলা যায় ' শৈশব' শব্দটি একটি সময়কালীন শব্দ বা সময়বাচক শব্দ। শৈশবের একটা নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করা সম্ভব। আসলে শৈশবকে একটা নির্দিষ্ট সময়কালে বেঁধে দেওয়া যায়। কিন্তু 'বাঙালির শৈশব' শব্দটি সময়বাচক শব্দ নয়। খেয়াল করলে বলা যায় 'বাঙালির শৈশব' শব্দটি আসলে একটি মানসিক শব্দ। 'শৈশব' সময়বাচক শব্দ কিন্তু 'বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি' মানসিক শব্দ কিভাবে হওয়া সম্ভব? শব্দটি যখন আমরা বলছি তখন বলছি 'বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণ'। কিন্তু শব্দটি ভাঙলে দুটি আলাদা আলাদা ধারণার হদিশ পাচ্ছি আমরা। কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? আসলে এটা 'Paradox'। শৈশব শব্দটি সময়বাচক শব্দ হলেও বাঙালির শৈশব সময়বাচক শব্দ নয়। বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি আসলে একটি Social Identity। বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি কোনো 'Individual Identity' নয়। অর্থাৎ এখানে নির্দিষ্ট কোনো শিশুর শৈশবের আইডেন্টিটির কথা বলা হচ্ছে

না। সমগ্র শিশুর শৈশবের আইডেন্টিটির কথা বলা হচ্ছে। 'শৈশব' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটি আসলে একটি বিশেষণ দাবি করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তৈরি হয়, কার শৈশবের কথা বলা হচ্ছে? উত্তরে যে কোনো জাতির শৈশবের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'বাঙালির শৈশব'। কারণ আমরা আমাদের শিরোনামে বাঙালির শৈশবের কথাই বলেছি। অন্যদিকে 'শৈশবের আইডেন্টিটি' সময়বাচক শব্দ নয় তা আমরা আগেই বলেছি এবং এটি যে একটি সামাজিক শব্দ তাও বলেছি। আসলে 'শৈশবের আইডেন্টিটি' শব্দদুটি কমিউনিটি থেকে উঠে আসা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। প্রশ্ন তৈরি হবে কমিউনিটি কি? কমিউনিটি বলতে বোঝায় একই জায়গায় বসবাসকারী মানুষের একটি গ্রুপ এবং যাদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ের মিল আছে। এখানে যে কমিউনিটির শৈশবের আইডেন্টিটির কথা বলা হচ্ছে, তা বাঙালি জাতি নামক কমিউনিটির শৈশবের আইডেন্টিটি। 'শৈশবের আইডেন্টিটি' কথাটি নিজে একটি সমাজতাত্ত্বিক ধারণার ইঙ্গিত আমাদের সামনে বহন করে আনে। কার্যত 'শৈশবের আইডেন্টিটি' কথাটি বিশেষভাবে বিশেষণ নির্ধারিত একটি কমিউনিটি বা গোষ্ঠীর চিহ্নকে বহন করে অগ্রসর হয়।

আমরা এই অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি 'রূপকথা-উপকথা এবং বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণ'। প্রশ্ন তৈরি হবে কে বাঙালি? কোন বাঙালির কথা বলা হচ্ছে এখানে? কে বাঙালি এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলে সেই বাঙালি। কোন বাঙালি এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় এখানে কেন্দ্র এবং প্রান্তের আপামর বাঙালির কথা বলা হচ্ছে না। এখানে যে বাঙালির কথা বলা হচ্ছে সেই বাঙালি আসলে কেন্দ্রে অবস্থান করা সমাজের উপরতলার লোক। যে বাঙালির কথা বলছি সেই বাঙালি পড়াশুনার সাথে যুক্ত। এই বাঙালি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্গ অথবা আধা উচ্চবর্গ। যে শৈশবের কথা বলছি আমরা তা আসলে এই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্গ শ্রেণির বাঙালির শিশুর শৈশব।

এটা আমাদের সকলের জানাবোঝার মধ্যে আছে উনিশ শতকের যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা সেই শিক্ষায় সবার সমান অধিকার ছিল না। বলা যায় এই শিক্ষা সবার জন্য নয়। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষা একটা নির্দিষ্ট অংশের মানুষের জন্য। এই শিক্ষার সাথে সমাজের প্রান্তে অবস্থান করা গতরখাটা মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না। উনিশ শতকে ভারতীয় জনমানসে বিদেশী শিক্ষার বিস্তারের এই বিশাল যজ্ঞে এই গতরখাটা মানুষরা সবসময় বাইরে অবস্থান করেছে। এটাও জানাবোঝার মধ্যে আছে, এই ঔপনিবেশিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় এবং রুচিতে ও মননে ইংরেজ এক শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে তোলা। এদের মাধ্যমেই যাতে ইংরেজদের স্বার্থ অটুট থাকে, এরকম বাসনা ইংরেজদের ছিল। এই শিক্ষিত মানুষগুলি সমাজে ভদ্রলোক বলে পরিচিত। উনিশ শতকের যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা সেই শিক্ষা আসলে সমাজের উপরিস্তরে থাকা এইসব মানুষের শিক্ষা। বাঙালি বলতে আসলে আমরা এদেরকেই বুঝি। আমাদের আলোচনায় আমরা যে শৈশবের কথা বলছি, যে শৈশবের নির্মাণের কথা বলছি তাও আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালির শিশুর শৈশব। এবং এই শিশুর শৈশব নির্মাণের কথা আমরা এখানে বলতে চাইছি।

আমরা আমাদের আলোচনায় যে তিনটি Text কে ব্যবহার করেছি, সেই তিনটি Text ও আসলে এদেশে ঔপনিবেশিক শিক্ষা বিস্তারের পরবর্তীতে লেখা। এই তিনটি Text আসলে বড়োদের দ্বারা লেখা ছোটোদের বই। শিশুর শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাইমারের পাশাপাশি এই text গুলির ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রাইমারগুলির মাধ্যমে, ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসারের কারণে নতুন যে বাঙালির শৈশবের ধারণা তৈরি হয়েছিল সেই শৈশবকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বাঁধার একটা প্রবণতা আমরা দেখেছি। বিধিবদ্ধ ‘গোপাল’ নির্মাণের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ, আরও আকর্ষক করে তোলার জন্য রূপকথা-উপকথারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যে শিশুর শৈশব নির্মাণের কথা বলছি আমরা তা আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষায়

শিক্ষিত বাঙালির শৈশব। আমাদের আলোচ্য যে Text, সেগুলির মাধ্যমেও আসলে এই বাঙালির শৈশব নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তারের সময়ে প্রান্তে অবস্থানকারী যে সমস্ত মানুষজন, যারা আসলে বাঙালি বলে পরিচিত কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত নয়, তাদের জন্য এই রূপকথা-উপকথা লেখা হয়নি। প্রান্তে অবস্থানকারী এই সমস্ত বাঙালির শিশুর শৈশব নির্মাণের জন্য এই রূপকথা-উপকথা লেখা হয়নি, একথা আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে।

এখন প্রশ্ন তৈরি হয়, এই যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্গ শ্রেণির শিশুর শৈশব নির্মাণের কথা বলা হচ্ছে এই শৈশব নির্মাণের কি কোনো স্থিরিকৃত চিহ্ন আছে। আদৌ কি বাঙালির শৈশবের কোনো স্থিরিকৃত চিহ্ন নির্ধারণ করা সম্ভব? বাঙালির শৈশবের কোনো স্থিরিকৃত চিহ্ন নেই এবং বাঙালির শৈশবের কোনো স্থিরিকৃত চিহ্ন নির্ধারণ করাও সম্ভব নয়। কারণ আমরা আগেই বলার চেষ্টা করেছি শৈশব একটি সময়বাচক শব্দ হলেও বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি কথাটি সময়বাচক শব্দ নয়। আসলে বাঙালির আইডেন্টিটির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটিরও পরিবর্তন হয়। কিভাবে হয়? আমাদের সবার জানাবোঝার মধ্যে আছে যে আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকের আগে শৈশব নামক ধারণার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। উনিশ শতকের আগে শিশু ছিল কিন্তু সেই শিশুর শৈশবকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্মাণ করতে হবে, এরকম চিন্তাভাবনা বাঙালির ছিল না। ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে উনিশ শতকে আমরা বাঙালির শৈশব নামক ধারণার সাথে পরিচিত হলাম তা আসলে একটা ক্রমপরিবর্তনশীল বিষয়। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশে শাসন করতে আসার আগে যে পরিচয় বাঙালির ছিল, ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাঙালির পরিচিতি পাল্টে গেছে। এই বাঙালির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘শিক্ষিত’, ‘মধ্যবিত্ত’, ‘উচ্চবর্গ’ ইত্যাদি বিশেষণ। আসলে সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস পরিবর্তনের

সাথে সাথে বাঙালির আইডেন্টিটি যেমন পাল্টাবে তেমনই সেই বাঙালির শিশুর শৈশবের আইডেন্টিটিও পাল্টে যাবে। এটাই আসলে স্বাভাবিক। আমাদের আলোচ্য যে তিনটি টেক্সট সেগুলির মধ্যেও আসলে বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণের খোঁজ পাওয়া যাবে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি খোঁজার চেষ্টা করবো।

বাঙালির শৈশব খোঁজার জন্য আমরা যে তিনটি টেক্সটকে নিয়েছি সেই টেক্সটের আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমরা একটু জেনে নেবার চেষ্টা করবো 'Intertextuality' কি? আমরা জানি 'Cultural Studies'এর অন্যতম একটা বিষয় হল 'Intertextuality', যার মূল কথা হল একটা টেক্সটের মধ্যে আর একটি টেক্সট কিভাবে 'Embedded' অবস্থায় থাকে। বাঙালির শৈশবকে খোঁজার সাথে সাথে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো কিভাবে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মূল রসদ 'বাংলার উপকথা'তে আছে। একইরকমভাবে 'রাঙাদির রূপকথা'র রসদ 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' বা 'বাংলার উপকথা'তে আছে। পরের আলোচনায় আমরা 'Intertextuality' কি তা জেনে নেবার চেষ্টা করবো।

'Intertextuality' বা অন্তঃপাঠসম্পর্ককে আমরা কি চোখে দেখতে পারি? কি এর অর্থ? খুব সহজভাবে বুঝতে চাইলে বলা যায় যদি কেউ তার লেখায় অপর কোনো লেখার কোনোরকম উক্তি বা ধারণাকে সচেতন বা অসচেতনভাবে ব্যবহার করে থাকে, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এখানে অন্তঃপাঠসম্পর্ক আছে। এর মাধ্যমে আসলে কোন লেখাটি আগেকার কোনো লেখার রেফারেন্স পাবার দরুণ কীভাবে কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে তার সবটাই বিচার হয়। 'Intertextuality' শব্দটি ১৯৬০ এর দশকে উত্তর অবয়ববাদী জুলিয়া কৃষ্টেভা প্রথম ব্যবহার করেন। এর পর থেকেই উত্তরাধুনিক লেখক ও পাঠক মহলে শব্দটির বহুল ব্যবহার হতে থাকে।

জুলিয়া তার এই তত্ত্বে বলেন যে মানুষ সব সময়ই একটি নতুন লেখা পড়তে পড়তেও নিজের এতদিনকার পড়া অন্যান্য লেখার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই থাকে। যখন একটা লেখা তার পূর্বেকার অন্য কোন লেখার আলোকে বিচার করা হয় তখন সহজাতভাবেই তার এক নতুন অর্থের স্তর আমাদের সামনে আসে। 'Intertextuality'র খুব পরিচিত একটা উদাহরণ হল জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' যা কিনা হোমারের 'ওডিসি'র এক পুনকথন। একইভাবে আমরা যদি 'মেঘনাদবধ' কাব্য দেখি, তা আসলে 'রামায়ণ'এর পুনকথন। এমনকি বাইবেলে নিউ টেস্টামেন্টেও ওল্ড টেস্টামেন্টের নানা উদ্ধৃতি দেখে থাকি আমরা।

"Any text is a new tissue of past citations. Bits of code, formulae, rhythmic models, fragments of social languages, etc., pass into the text and are redistributed within it, for there is always language before and around the text. Intertextuality, the condition of any text whatsoever, cannot, of course, be reduced to a problem of sources or influences; the intertext is a general field of anonymous formulae whose origin can scarcely ever be located; of unconscious or automatic quotations, given without quotation marks"[৪] .

রলাঁ বার্তের এই কথায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে Intertextuality-র ব্যাপ্তির কথা। সাথে সাথে এও বোঝা যাচ্ছে Intertextuality সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে ঘটতে পারে। Intertextuality কোন পুরনো লেখার নতুন প্যারোডি হতে পারে বা কোন একটি লেখার স্থান কাল এমনকি পাত্র বদলে দিয়ে নতুনভাবে সেই লেখাকে হাজির করা হতে পারে কিংবা লেখার মধ্যে পূর্বতন নানা লেখার উদ্ধৃতি বা প্লটলাইনের মিল হতে পারে। এর বাইরেও Intertextuality-র নানা রকম থাকতে পারে।

"Any text is constructed of a mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another"[৫] .

জুলিয়ার এই মন্তব্যে, কি করে একটা টেক্সট বা লেখা তৈরি হচ্ছে এবং তা আসলে Intertextuality-র জন্ম দিচ্ছে তা ধরা আছে। Intertextuality বা এই নানারকম লেখার মধ্যেকার সম্পর্ক, এই সম্পর্ককে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আবশ্যিক(Obligatory), ঐচ্ছিক(Optional), দৈবাৎ(Accidental).

'Obligatory Intertextuality' বলতে বোঝায়, এখানে একজন লেখক খুব উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সচেতনভাবে অন্য কোন লেখার রেফারেন্স টেনে নিজের লেখাকে সাজায়।

'Optional Intertextuality' বলতে, এখানে একজন লেখকের লেখায় কোন একটি বাক্য বা অংশে অন্য একাধিক লেখার সংযোগ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বা কোন লেখার কোন সংযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে।

'Accidental Intertextuality' বলতে, যখন একজন পাঠক তার সামাজিক অর্থনৈতিক শ্রেণী অবস্থানের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে কোন লেখা পড়তে গিয়ে সেই লেখার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে অন্য কোন লেখার সংযোগ আবিষ্কার করে তখন সেই ধরণের লেখাকে আমরা এই বিভাগের মধ্যে ফেলতে পারি[৬]।

'Intertextuality' বা পাঠের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক বিষয়টি আমরা আলোচনা করে নিলাম এই কারণে যে এর পরের যে আলোচনায় আমরা প্রবেশ করবো সেখানে আমরা দেখার চেষ্টা করবো, আমাদের আলোচনায় যে তিনটি টেক্সটকে আমরা নিয়েছি সেই তিনটি টেক্সটের মধ্যে বাঙালির শৈশব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে কিনা এবং সেই সঙ্গে এই তিনটি টেক্সটের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা অর্থাৎ 'বাংলার উপকথা' বইটির প্রভাব 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'তে আছে কিনা বা 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র প্রভাব 'রাঙাদির রূপকথা' বইটির মধ্যে আছে কিনা তা আমরা দেখবো।

এই অধ্যায়ে আমাদের বলার বিষয় ছিল নির্বাচিত তিনটি বইয়ের তুলনামূলক আলোচনা। আমরা আমাদের এই পুরো কাজ জুড়ে এটা বলার চেষ্টা করেছি উনিশ শতকের পরবর্তী ঔপনিবেশিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে বাঙালির শিশুর শৈশবকে নিয়ে মাতামাতি তা আসলে পুরোটাই নির্মিত। এই শৈশবটা আসলে একটা নির্মিত শৈশব। এই শৈশবের নির্মাণের জন্য যা কিছু মেটেরিয়াল সবটাই আসলে তৈরি করা। আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো এই শৈশবের জন্য যারা এই মেটেরিয়ালগুলো তৈরি করছেন তারা কেউ শিশু নয়। তার মানে আমাদের এই নির্বাচিত বইগুলিতে যে শৈশবটা এঁরা নির্মাণ করতে চাইছেন, আসলে এঁদের অবস্থানটা যে শৈশবটা নির্মাণ করতে চাইছে সেটাকেই আমরা শৈশব বলে চিহ্নিত করতে চাইছি। শৈশবটা আসলে এঁদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া। ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া এই বইগুলিতে শৈশবকে গ্রহণ করার ধরণ এঁদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে পাল্টে পাল্টে গেছে। লালবিহারী দে'র শৈশবকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি যেরকম, দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদারের শৈশবকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তেমনটা নয়। আবার ত্রিভঙ্গ রায়ের শৈশবকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা বাকি দুজন লেখকের থেকে। আসলে এঁদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে শৈশব ধারণাটাও পরিবর্তিত হতে হতে গেছে।

আমরা আমাদের আলোচনায় যে তিনটি টেক্সট নিয়েছি সেগুলি হল রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'বাংলার উপকথা' (১৮৮৩), দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার'এর 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' (১৯০৭), ত্রিভঙ্গ রায়'এর 'রাঙাদির রূপকথা' (১৯৭০)। প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে এই তিনটি বই কেন? প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে এই তিনটি বই ক্রমানুসারে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, বিশ শতকের প্রথমার্ধ ও বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটি বই আসলে তিনটি আলাদা আলাদা সময় প্রেক্ষাপটকে বহন করছে। আমরা আমাদের আলোচনার এই আলাদা আলাদা সময় প্রেক্ষাপটকে বোঝার চেষ্টা করবো। আমাদের মনে হয়েছে এই তিনটি বইয়ের প্রকাশের

সময় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলকে চিহ্নিত করে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসার এবং মহাবিদ্রোহের পরবর্তীতে কোম্পানির শাসন থেকে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসনাধীন ঔপনিবেশিক অঞ্চলে যখন জাতীয়তাবাদ প্রাথমিকভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে সেই সময় লালবিহারী দে'র বইটির প্রকাশ। আবার অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী উত্তুঙ্গ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সঙ্গে নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'। অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষত, চাওয়া-না পাওয়ার মধ্যে হিসেব মেলাতে না পারার যন্ত্রণা; তৎসহ খাদ্য আন্দোলন, একের পর এক কৃষক অসন্তোষ, খাদ্য সংকটকে মাথায় নিয়ে উত্তাল সত্তর দশকের প্রাক্‌লগ্নে ত্রিভঙ্গ রায়ের বইটির আত্মপ্রকাশ। বাঙালির শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনটি আলাদা আলাদা প্রেক্ষাপট প্রভাব ফেলতে বাধ্য। আমরা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে এই ভিন্নতর প্রভাবের 'পরিবর্তনশীল চল' গুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আমরা খুব অল্প কথায় এই বইগুলির গড়ে ওঠার ইতিহাসটা বলার চেষ্টা করবো। ১৮৮৩ তে প্রকাশিত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'বাংলার উপকথা' বইটির কথা বলি তাহলে বলা যেতে পারে ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রসার এবং মহাবিদ্রোহের পরবর্তীতে কোম্পানির শাসন থেকে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসনাধীন অঞ্চলে যখন জাতীয়তাবাদ প্রাথমিকভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে সেই সময় এই বইটির প্রকাশ। আবার যদি আমরা ১৯০৭ সালে প্রকাশিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' বইটির দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাবো এই বইটির প্রকাশের প্রেক্ষাপট 'বাংলার উপকথা' বইটির থেকে আলাদা। 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইটি আসলে গনগনে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নিয়ে প্রকাশিত। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত ত্রিভঙ্গ রায়ের 'রাঙাদির রূপকথা' বইটি আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষত, চাওয়া-না পাওয়ার মধ্যে হিসেব মেলাতে না পারার যন্ত্রণা এবং সেইসঙ্গে খাদ্য আন্দোলন, কৃষক অসন্তোষ, খাদ্য সংকটকে মাথায় নিয়ে প্রকাশিত। এখন যদি আমরা একটু ভালো করে

খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে তিনটি বইয়ের প্রকাশের যে সময় সেই সময়কালের মধ্যে প্রায় ৯০ বছরের মতো একটা সময়কালকে ধরা আছে। বইগুলির নামের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বা বইগুলির মধ্যে থাকা গল্পগুলি প্রায় একইরকম, এরকমটা আমাদের মনে হতেই পারে কিন্তু আসলে বইগুলি একইরকম বই নয়। বইগুলির মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য যেমন আছে ঠিক তেমনভাবে বইগুলির মধ্যে আঙ্গিকগত পার্থক্যও আছে। আমরা বলেছি বইগুলির প্রকাশের প্রেক্ষাপট আলাদা। তাই বিষয় যেমন আলাদা হবে, তেমনই আঙ্গিকগত পার্থক্যও হবে। আসলে ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত শৈশবের জন্য নির্মিত বই বা ১৯০৭ সালে প্রকাশিত শৈশবের জন্য নির্মিত বই বা ১৯৭০ সালে প্রকাশিত শৈশবের জন্য নির্মিত বইয়ের আঙ্গিকগত পার্থক্য আছে। তাই 'শৈশব' শব্দটি সময়বাচক শব্দ হলেও আমরা যে 'বাঙালির শৈশব'এর কথা বলছি সেটা কোনোভাবেই সময়বাচক শব্দ নয়। বাঙালির শৈশব পরিবর্তনশীল। আসলে এই তিনটি বইয়ের প্রকাশের মধ্যেকার যে সময় সেই মধ্যবর্তী সময়ে 'বাঙালির শৈশব' কিন্তু পরিবর্তিত হতে হতে যাচ্ছে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা 'বাঙালির শৈশব'এর এই পরিবর্তিত রূপটিকে খোঁজার চেষ্টা করবো।

আমরা আমাদের কাজের জন্য যে তিনটি বই নিয়েছি সেই তিনটি বইয়ের গল্পগুলির দিকে আমরা একটু নজর দেব। গল্পগুলির দিকে নজর দেব মানে আমরা হুবহু গল্প বলে যাবো না। প্রয়োজনে গল্পের কাহিনী আসবে, কিন্তু লাইন ধরে গল্প আমরা বলব না। এই তিনটি বইয়ের গল্পগুলি যাদের জন্য লেখা সেই উদ্দিষ্ট পাঠককে আমরা গল্পগুলির মধ্য দিয়ে খোঁজার চেষ্টা করবো। গল্পগুলির মধ্যে উদ্দিষ্ট পাঠকের চরিত্রের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা আমরা পরবর্তী আলোচনায় খোঁজ করার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই যদি আমরা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র 'বাংলার উপকথা' বইটির দিকে নজর দিই তাহলে সেখানে দেখবো লালবিহারী দে ভূমিকায় বলছেন –

" আপেক্ষিক দর্শন অনুশীলন করলেও যেমন হয়, এতেও প্রমাণ হবে যে গঙ্গাতীরের কালো কালো প্রায় উলঙ্গ চাষী হল গিয়ে টেমস নদীর ধারে ফরসা সুবেশ ইংরেজের-ই ভাই, তা সে যতই দূর সম্পর্কের হক না কেন"[৭]।

উল্লিখিত কথাগুলির মধ্য দিয়ে লালবিহারী দে আসলে এটা প্রমাণ করতে চাইছেন বাঙালিও বিদেশীদের সমান যোগ্য। আসলে বাঙালিকে সামনের সারিতে তুলে আনার চেষ্টা আছে এখানে। বইটি ইংরেজি ভাষায় লেখা, এটা আমাদের অজানা নয়। ইংরেজি ভাষায় লেখার মাধ্যমে লেখক এটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন হয়ত যে বাঙালি সবদিক দিয়েই উন্নত। বাঙালিকে খাটো করা যে অনুচিত তা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন হয়তো।

বইটির অনুবাদক লীলা মজুমদার বইটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন –

"লেখার ধরনে কোনো মমতার পরিচয় নেই, নিরলঙ্কার ভাবে গল্পের কাঠামোগুলো ধরে দিয়েছেন, কোথাও কোনো তত্ত্বকথা আরোপ করেননি, বর্ণনার বাহুল্য নেই, সংলাপ অনেক জায়গায় অতি নীরস। আশ্চর্যের বিষয় হল তবু সেই ন্যাড়া বিবৃত্তির অসম্ভব, অবাস্তব, অভাবনীয় সব ঘটনার মধ্যে দিয়েও সেকালের বাঙালীর চরিত্র, তার আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ মেশা জীবনযাত্রা কেমন ফুটে উঠেছে। কিছু বাদ যায়নি, একদিকে সেই জাঁকজমক, অন্য দিকে সেই অভাব-অনটন, সেই চিরদিনের লোভ, হিংসা, বিফলতা, ব্যর্থতা; সেই মহত্ত্ব, সেই সার্থকতা। গল্পকারের নিজের চরিত্রের বলিষ্ঠতা গল্পের মধ্যে ছাড়া পেয়েছে"[৮]।

গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে বাঙালীর বাঙালীত্বকে ধরতে চেয়েছেন লেখক। বইটির মূল ভিত্তি ছিল বাঙালী কৃষি জীবন। কিন্তু -

"তা সত্ত্বেও ঐ সোনার কাঠি রূপোর কাঠির কথায়, ঐ রূপসী-তরুণীর বেশে রাক্ষসের কথায়, ঐ নৌকো সাজিয়ে সাগর পেরিয়ে দূর দ্বীপে যাওয়ায়, এমন একটা প্রবল বাঙালী ভাব আছে যে তাকে চিনতে আর ভুল হয় না"[৯]।

আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে যখন জাতীয়তাবাদের ধারণা এত প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়নি, জাতীয়তাবাদ যখন প্রাথমিকভাবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে সেই সময় এই বইটির প্রকাশ। শিশুর কথা ভেবে বইটি লেখা হয়নি কিন্তু গল্পগুলোর মধ্যে যে একটা প্রবল বাঙালী ভাব আছে,

সেটাকে শিশুর কাছে পরিচিত করানো হচ্ছে। বাঙালীর বীরত্ব দেখানোর মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যেও কি বীরত্বের প্রকাশ ঘটানোর চেষ্টা নেই! এই বাঙালীর বীরত্বটাই আসলে বাঙালীর শৈশবের আইডেন্টিটির মুখ্য পরিচায়ক।

'গোপন প্রাণ' গল্পটি যদি দেখি তাহলে সেখানে দেখতে পাবো রাজপুত্র ডালিমকুমারের স্ত্রী নাপতেনী সাজছে তার স্বামীর জীবন গচ্ছিত আছে যে হারটির মধ্যে সেটি ফিরিয়ে আনার জন্য। এখানে ডালিমকুমারের স্ত্রী-এর বীরত্ব প্রকাশিত। আমরা দেখতে পাবো নিজের ছেলেকে হার নেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছেন তিনি। গল্পটিতে দুওরাণী যখন হারটি ফেরত চাইছে তখন ডালিমকুমারের ছেলে তা দুওরাণীকে দিতে অস্বীকার করছে। তখন ডালিমকুমারের স্ত্রী বলছে – "রাণীমা, দয়া করে যদি ওকে ওটি নিয়ে বাড়ি যেতে অনুমতি দেন, তাহলে ওকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমি হার ফিরিয়ে নিয়ে আসব"। (বাংলার উপকথা, গোপন প্রাণ, পৃ: ২৪) এখানে রাজপুত্র নয় বরং একজন মহিলার বীরত্ব প্রকাশিত। এই বীরত্বের মধ্যে কৌশল থাকলেও এই কৌশলটাই একপ্রকার বীরত্ব হিসাবে দেখানো হচ্ছে।

'ফকিরচাঁদ' গল্প শুরুই হচ্ছে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের কৌশল অবলম্বন করেই। এক প্রকাণ্ড অজগর সাপকে মারার কৌশল হিসাবে তারা সাপের মাথার মণিটিকে নেবার সিদ্ধান্ত করেছে। এবং শেষপর্যন্ত মণিটিকে তারা হস্তগতও করেছে। সাপের মাথার মণি নিয়ে তারা জলে ডুব দিয়েছে এবং দেখতে পেয়েছে সুন্দরী রাজকন্যাকে। রাজকন্যা যখন জানতে চেয়েছে তারা কিভাবে এল, তার উত্তরে তারা তাদের বীরত্ব প্রকাশ করতে অস্বস্তিবোধ করেনি। মন্ত্রীপুত্র বলেছে "সে মরে গেছে, তোমার আর কোনো ভয় নেই। ওর মাথার মণির আলোয় পথ দেখে আমরা এখানে এসেছি"। (বাংলার উপকথা, ফকিরচাঁদ, পৃ: ৩০) তারপর রাজকন্যাকে রাজপুত্রর ভালো লেগেছে এবং রাজপুত্র রাজকন্যার বিয়ে হয়েছে। পরবর্তীতে রাজকন্যার আটক হওয়া, রাজকন্যার এক বছর ব্রত পালন করা এবং মন্ত্রীপুত্রের ফকির সেজে

রাজকন্যাকে উদ্ধার করা বর্ণিত হয়েছে। এখানে বাঙালির বীরত্ব প্রকাশিত কৌশলকে অবলম্বন করে।

'রাক্ষসের গল্প'এ আমরা দেখতে পাবো চম্পক-দল ও সহস্র-দলের বীরত্বের কাহিনী। মা রাক্ষসী হলেও সহস্র-দল নিজের মাকে মারতে কোনো দ্বিধাবোধ করেনি। গল্পে দেখতে পাই রাক্ষসী মা যখন চম্পক-দল কে খেতে আসছে তখন ভাইকে বাঁচানোর জন্য সহস্র-দল তলোয়ার দিয়ে রাক্ষসীর মাথা কেটে ফেলেছে। সহস্র-দলের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই "চম্পক-দল, ভাই, দুষ্ট রাক্ষসী মরেছে। আমি তাকে মেরে ফেলেছি।" (বাংলার উপকথা,রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৭২) পরবর্তীতে কাহিনী যত এগিয়েছে আমরা দেখেছি রাক্ষসে সারা রাজ্য ঘিরে রেখেছে। প্রতিদিন তার খিদে মেটানোর জন্য রাজ্যের কাউকে না কাউকে যেতে হয়। এক গৃহস্ত বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া চম্পক-দল, সহস্র-দল তাদেরকে যেতে না দিয়ে নিজেরা গেছে রাক্ষসীর খাবার হতে। সেখানে গিয়ে তারা সেই রাক্ষসীকে মেরে রাজ্যের সবাইকে উদ্ধার করেছে। গল্পে আমরা দেখতে পাবো "সেই শব্দ শুনেই সহস্র-দলের ঘুম ভেঙে গেল। তক্ষুণি সে লাফিয়ে উঠে, তালপাতার মতো লিকলিকে তলোয়ারখানি বের করে এক কোপে রাক্ষসীর মুণ্ডু কেটে ফেলল। পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড ধড়টা পড়ে রইল মন্দিরের বাইরে। মুণ্ডুটাকে মন্দিরের ভিতরে টেনে এনে, ভাঙা দরজায় ঠেকা দিয়ে; সহস্র-দল আর চম্পক-দল আবার ঘুমিয়ে পড়ল।" (বাংলার উপকথা, রাক্ষসের গল্প, পৃ: ৭৬) এখানেও আছে কৌশল অবলম্বন করে রাজকন্যা উদ্ধারের গল্প। আমরা দেখতে পাবো চম্পক-দল বামুন পণ্ডিত সেজে রাজকন্যা কেশবতীকে উদ্ধার করছে।

'সাত মায়ের এক ছেলে' গল্পে আমরা দেখতে পাবো একজন রাজাকে। তার সাতটি রাণী থাকা সত্ত্বেও তিনি আরো একটা বিয়ে করেন। নতুন রাণী রাক্ষসী তা রাজা জানতেন না। এই ছোটো রাণীর কারণেই রাজা বাকি সাত রাণীকে বনে পাঠিয়ে দেন। সেখানে সাত রাণীর সাতটি ছেলে

হয় কিন্তু ছোটো রাণীর ছেলেটাই শুধু বাঁচে। বুদ্ধি, বল এবং সাহসে সেই ছেলে অন্য সবার থেকে অনেকটাই এগিয়ে তা গল্পে জানানো হয়েছে। এই ছেলেটির নাম শোভন। নিজের মায়েদের কষ্ট মেটানোর জন্য, রাজা এবং রাজপুরীকে রক্ষা করার জন্য যা কিছু শোভন করেছে তাতে তার বীরত্ব প্রকাশিত। গল্পে আমরা দেখতে পাবো শোভন(রাজপুত্র) চাকর সেজে রাজপুরীতে চাকরি নিয়েছে। রাজপুত্র শোভনের চাকর সেজে রাক্ষসী রাণী এবং তার বংশকে শেষ করার কথা এই গল্পে আছে। রাক্ষসীর নির্দেশিত যে পথ, সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে তার দেশে গিয়ে তার বংশকে শেষ করার মধ্য দিয়ে রাজপুত্র শোভনের বীরত্ব প্রকাশিত।

'চুনীর জন্ম' গল্প শুরু হয়েছে রাজার কথা দিয়ে। রাজা তার এক রাণী এবং চার ছেলেকে রেখে মারা গেছে। এই চার ছেলের মধ্যে রাণী ছোটো ছেলেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতো। সেই কারণে তিন ছেলে মাকে এবং ছোটো ছেলেকে আলাদা জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরবর্তীতে আমরা দেখবো ছোটো ছেলে নৌকো নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে, মাও তার সঙ্গী। নৌকো গিয়ে এক বন্দরে পৌঁছানো সেখানে রাজার রাজধানীর পাশে থাকা এবং এক লাল পাথর নিয়ে টানাটানি বর্ণিত হয়েছে। গল্পে দেখেছি ছোটো ছেলের কাছে লাল পাথর দেখে ঐ রাজ্যের রাজার মেয়ে ঐ লাল পাথর নেবার বায়না করেছে। ছোটো ছেলে সেটা দিয়েও দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আবার একটা ঐ একই রকম পাথরের বায়না করলে ছোটো রাজপুত্র নৌকো নিয়ে তার অভিযান শুরু করেছে। "রাজপুত্র বাড়ি গিয়ে মাকে বললেন, "রাজার জন্য আরো কিছু রত্ন সংগ্রহ করতে তিনি সমুদ্র যাত্রা করবেন"। (বাংলার উপকথা, চুনীর জন্ম, পৃ: ২২১) যাত্রা করে ছোটো রাজপুত্র আবার পুরনো জায়গায় ফিরে গেছে, সাহস করে মণি কোথা থেকে আসে তা দেখার জন্য সে সমুদ্রে ডুব দিয়েছে, সেখানে গিয়ে এক পুরীর দেখা পেয়েছে। পুরীতে গিয়ে রাজকন্যার সন্ধান পেয়েছে, রূপোর কাঠি সোনার কাঠি

দিয়ে রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে প্রচুর ধনরত্ন সহ রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে ফিরে এসেছে। এখানে ছোটো রাজপুত্রের বীরত্ব এভাবেই প্রকাশিত।

আমাদের আলোচনায় দ্বিতীয় যে বইটি আমরা নিয়েছি সেটি হল দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল পরিস্থিতিকে মাথায় নিয়ে ১৯০৭ সালে এই বইটির আত্মপ্রকাশ। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, যাকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়, এই সময়পর্বে বাঙালি জাতি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। নিজেকে চিনতে চেয়েছে নতুনভাবে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার কারণে যে বাঙালি নিজের দেশকে ভুলতে বসেছিল, দেশের মানুষকে ভুলতে বসেছিল সেই বাঙালি ১৯০৫ সালের ঐ সময়পর্বে এসে নিজের দেশ, নিজের জাতি সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। বাঙালি জাতির ঐতিহ্যকে নতুন করে তুলে ধরার জন্য যা কিছু এতদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল তাকে সামনে তুলে আনা হচ্ছে। যা কিছু মৌখিক ঐতিহ্য হিসাবে প্রচলিত ছিল তাকে সংকলন করে স্বাদেশী বলে প্রচার করা হচ্ছে। মোট কথা বাঙালি তাঁর প্রবল বাঙালিত্ব নিয়ে এই সময়পর্বে উপস্থিত। ১৯০৭ সালের 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' আসলে বাঙালির প্রবল বাঙালিত্বের প্রকাশ। এখানে বাঙালির বীরত্ব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বইটির ভূমিকা অংশটি যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন –

"ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বাদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে?"[১০]

'বাংলার উপকথা' আনুবাদক লীলা মজুমদার 'বাংলার উপকথার' ভূমিকা অংশে বলেছেন বইটির গল্পগুলির মধ্যে একটা প্রবল বাঙালি ভাব আছে। কিন্তু 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'র ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এখানে প্রবল বাঙালি ভাব থাকার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির প্রবল বাঙালিত্বও প্রকাশিত। এই প্রবল বাঙালিত্ব বাঙালি তাঁর শিশুর মধ্যেও সঞ্চার করতে চেয়েছে।

"অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে – সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়"[১১]।

বইটিতে যে চোদ্দটি গল্প বর্ণিত হয়েছে, উপদেশমূলক প্রাইমারগুলির পাশাপাশি এই গল্পগুলির মধ্য দিয়েও বাঙালি তার শিশুর শৈশবকে নির্মাণ করতে চেয়েছে। গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে বাঙালির বীরত্বও প্রকাশিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। এই বীরত্ব যাদের মগজে প্রেরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই তাদেরকে আমরা এই গল্পগুলির মধ্য দিয়ে খুঁজবো। গল্পগুলির মধ্য দিয়ে আমরা উদ্দিষ্ট পাঠককে খোঁজার চেষ্টা করবো।

'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পটি যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমেই আমরা দেখতে পাবো এক নিঃসন্তান রাজা এবং তার সাত রাণীকে। সন্ন্যাসীর মন্ত্রপূত শিকড় খেয়ে প্রথম পাঁচ রাণীর দেবদর্শন ছেলে হয় এবং শেষ দুটি রাণী বানর ও পেঁচার জন্ম দেয়। গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাবো বানর বা পেঁচা আসলে সত্যিকারের বানর বা পেঁচা নয়। তারাও রাজপুত্র। রাজমহল পাহারা দেবার কারণেই তারা খোলস পরে থাকতো। পাঁচ রাজপুত্র এবং বুদ্ধু আর ভূতুমের বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে একজন রাজকন্যাকে ঘিরে। তাকে উদ্ধার করার জন্য যে দুঃসাহসিক অভিযান তাকে আমরা দেখাতে চাইছি। কলাবতী রাজকন্যাকে উদ্ধার করার জন্যই পাঁচ রাজপুত্রের ময়ূরপঙ্খী নৌকা নিয়ে যে অভিযান সঙ্গে বুদ্ধু এবং ভূতুমের সুপারির ডোঙ্গায় করে কলাবতী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যাবার মধ্য দিয়ে আসলে এদের বীরত্ব বর্ণিত। গল্পের ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো – "ছুতোরের বাড়ী যাইতে-যাইতে পথে ভূতুম আর বুদ্ধু দেখিল, দুইখানি সুপারীর ডোঙ্গা ভাসিয়া যাইতেছে। বুদ্ধু বলিল, "দাদা, এই তো আমাদের না'; এই নায়ে উঠ"। ভূতুম বলিল, - "উঠ"। তখন, বুদ্ধু আর ভূতুম দুইজনে দুই নায়ে উঠিয়া বসিল। দুই ভাইয়ের দুই ময়ূরপঙ্খী যে পাশাপাশি ভাসিয়া চলিল"।

(ঠাকুরমার ঝুলি, কলাবতী রাজকন্যা, পৃ: ৪০) পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে বুদ্ধু কলাবতী রাজকন্যাকে জয় করেছে কলাবতীর বলা শর্তগুলিকে পূরণ করেই। কলাবতীর শর্ত ছিল যে তিন বুড়ীর রাজ্য পার করে, রাঙ্গা-নদীর জল পাড়ি দিয়ে কাঁথা-বুড়ী আর অন্ধকুঠরীর হাত এড়িয়ে তার পুরীতে এসে যে মোতির ফুল নিতে পারবে সেই তার স্বামী হবে। বুদ্ধু আসলে সেই কঠিন কাজটাই করে কলাবতী রাজকন্যাকে জয় করেছে। এই যে বীরত্ব এটাই আমরা গল্পে দেখতে পাচ্ছি।

'ঘুমন্ত পুরী' গল্প শুরুই হয়েছে এক রাজপুত্রের দেশভ্রমণে যাবার মধ্যে দিয়ে। দেশভ্রমণে যাওয়া আসলে বাঙালির ঘর থেকে বাইরে যাবার আকাঙ্ক্ষা। বাঙালি যে আর ঘরে বসে থাকবে না, সেও যে দেশভ্রমণে যেতে পারে তা প্রকাশিত এখানে। "একদিন রাজপুত্রের মনে হইল, দেশভ্রমণে যাইবেন। রাজ্যের লোকের মুখ ভার হইল, রাণী আহার-নিদ্রা ছাড়িলেন, কেবল রাজা বলিলেন, - 'আচ্ছা, যাক"। দেশভ্রমণে যাবার জন্য রাজা ব্যবস্থা করলেও রাজপুত্র কিছুই নিল না। একা গেল দেশভ্রমণে। "রাজপুত্র লোকজন, মণি-মাণিক্য, চর-আনুচর কিছুই নিলেন না। নূতন পোষাক পরিয়া, নূতন তরোয়াল ঝুলাইয়া রাজপুত্র দেশভ্রমণে বাহির হইলেন"। (ঠাকুরমা'র ঝুলি, ঘুমন্ত পুরী, পৃ: ৫৩) এখানে রাজপুত্রের সাহসিকতাকে দেখানোর প্রচেষ্টা আছে। বাঙালি যে সাহসী তা বোঝানোর চেষ্টা আছে। গল্পের কাহিনী যত এগিয়েছে আমরা দেখেছি রাজপুত্র বহু দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে এক অজানা রাজপুরিতে এসেছে। সেখানে এক ঘুমন্ত রাজকন্যার খোঁজ পেয়েছে। তাকে মরণ ঘুমের কবল থেকে উদ্ধার করে তাকে জয় করেছে।

'পাতাল কন্যা মণিমালা' গল্পে আমরা প্রথমেই দেখতে পাবো রাজপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্র দেশভ্রমণে যাচ্ছে। পথে সন্ধ্যা হয়ে যাবার কারণে তারা গাছের ডালে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর সেখানে একটা বিশালাকার সাপের আগমন এবং তার মাথার মণিটি নিয়ে তারা পাতালপুরীতে প্রবেশ করে। সেখানে গিয়ে তারা একটা পুরীর সন্ধান পান। সেখানে গিয়ে রাজকন্যা

মণিমালাকে উদ্ধার করে তাকে বিয়ে করে রাজপুত্র সেখানে থাকতে শুরু করেন। তারপর সেখান থেকে মন্ত্রীপুত্রের রাজ্যে ফিরে আসা, মণিমালাকে আটক করা, মন্ত্রীপুত্রের পেঁচো সেজে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে রাজপুত্র সহ দেশে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে রাজপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্রের সাহসিকতা, বীরত্ব প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার উপকথা সংকলনের 'ফকিরচাঁদ' গল্পের সাথে এই গল্পের সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই।

'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পের শুরু রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র এবং কোটালপুত্রকে নিয়ে। এই চারজনের দেশ ছাড়া দিয়ে গল্পের শুরু। এই চারজনের তেপান্তরের মাঠে আসা, রাক্ষসীর মায়ায় পড়া, রাক্ষসীর দ্বারা রাজপুত্র ছাড়া বাকি তিনজনের মৃত্যু এবং রাজপুত্রের পালিয়া যাওয়া বর্ণিত। পরে আমরা দেখেছি সেই রাক্ষসীর মানুষ রূপে রাজার রাজ্যে আসা এবং রাজপুত্রকে খাবার জন্য শরীর খারাপের ভান করা। শরীর সারার জন্য রাজাকে উপায় বলা এবং শেষপর্যন্ত গৃহস্থের বাড়ি থেকে রাজপুত্রকে আটক করা এবং রাজার নির্দেশ মতো রাক্ষসী রাণীর শরীর সারানোর জন্য ওষুধ আনতে যাওয়া এবং রাজকন্যার সন্ধান পাওয়া এবং রাক্ষসের বংশ শেষ করে রাজকন্যা নিয়ে ফিরে আসা পুরোটাই রাজপুত্র সাহসিকতার সাথে করেছে। এখানে রাজপুত্রের যে সাহসিকতা, বীরত্ব তা খুব স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। এই গল্পটির সাথে আমরা সাদৃশ্য পাবো বাংলার উপকথা সংকলনের 'সাত মায়ের এক ছেলে' গল্পের।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পেও বাঙালির বীরত্ব একইরকমভাবে প্রকাশিত। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই এক রাজার দুই রাণী। এই দুই রাণীর মধ্যে একজন রাক্ষসী। এই দুই রাণীর দুই ছেলে। একজন অজিত অন্যজন কুসুম। এই দুই ছেলেকে মেরে ফেলা এবং তাদেরকে খেয়ে ফেলার বর্ণনা আমরা পাই। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো এক কৃষকের দ্বারা এই দুই ভাইয়ের আবার জন্মগ্রহণ এবং এই দুই রাজপুত্রের নতুন নাম হয় নীলকমল আর লালকমল।

নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করে দুই রাজপুত্র আসে নিজেদের রাজ্যকে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার করতে। পথে এক রাজ্যে গিয়ে খোক্কস মেরে দুই রাজকন্যাকে পাবার কথা আছে। "লালকমল আর নীলকমল জোড়া রাজপুত্র রাজার কাছে গিয়া বলিলেন 'আমরা খোক্কস মারিতে আসিয়াছি!"(ঠাকুরমার ঝুলি, নীলকমল আর লালকমল, পৃ: ১২৪) এই কথাটির মধ্য দিয়ে রাজপুত্রের বীরত্ব দেখানো হয়েছে। নিজেদের রাজ্যে যখন দুই রাজপুত্র আসে তারা দেখে পুরো রাজ্য রাক্ষসের অধিকারে। পথে বেঙ্গম-বেঙ্গমী দ্বারা রাক্ষসের মৃত্যুর উপায় জানা এবং রাক্ষসের বংশ শেষ করার বর্ণনা আছে পরবর্তী গল্প জুড়ে। "জীয়নকাটি রাক্ষসের প্রাণ, আর মরণকাটি যে, সেই রাক্ষসরাণীর প্রাণ। নীল নিলেন জীয়নকাটি, লাল নিলেন মরণকাটি। জীয়নকাটি মরণকাটি – ভীমরুল ভীমরুলীর, গায়ে বাতাস লাগিতেই, মাথা কন-কন বুক চন-চন, রাক্ষসের মাথায় টনক পড়িল; বোকা রাজার দেশে রাক্ষসী-রাণী ঘুমের চোখে ঢুলিয়া পড়িল। মাথায় টনক, বুকে চমক; দীঘল দীঘল পায়ে রাক্ষসেরা নদী পর্বত এড়ায়, ধাইয়া ধাইয়া আসে! দেখিয়া নীলকমল জীয়নকাটির পা দুইটি ছিঁড়িয়া দিলেন। যত রাক্ষসের দুই পা খসিয়া পড়িল। দুই হাতে ভর, তবু রাক্ষস ছুটিয়া ছুটিয়া আসে – নীলকমল জীয়নকাটির আর চার পা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যত রাক্ষসের হাত খসিয়া পড়িল!" (ঠাকুরমা'র ঝুলি, নীলকমল আর লালকমল, পৃ: ১৩৪) এখানে দুই রাজপুত্রের সাহসিকতা, ডুব দিয়ে রাক্ষসদের প্রাণভোমরা নিয়া আসা, রাক্ষসরাণীকে মেরে রাজা এবং রাজ্যকে উদ্ধার করার যে বিবরণ আছে তাতে যে বীরত্ব সেটাই আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়।

আমাদের আলোচনায় তৃতীয় যে বইটি গৃহীত হয়েছে সেটি হল ত্রিভঙ্গ রায়ের 'রাঙাদির রূপকথা'। বইটির প্রকাশকাল ১৯৭০। ১৯৭০ অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। ঠাকুরমার ঝুলি প্রকাশের প্রায় তেষট্টি বছর পর প্রকাশিত। ১৯০৭ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য আপামর ভারতবাসী সহ বাঙালি জাতির সংগ্রামে

ঝাঁপিয়ে পড়া। আমরা দেখেছি স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষত, চাওয়া-না পাওয়ার মধ্যে হিসাব না মেলাতে পারার যন্ত্রণা। আমরা দেখেছি খাদ্য আন্দোলন। দেখেছি খাদ্য সংকট। এই এত এত জ্বলন্ত সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে এই বইটির আত্মপ্রকাশ।

স্বাধীনতা লাভ করার পর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যা কিছু সমস্যা সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি। দেশের পরিচালন ব্যবস্থায় অব্যাহত ছিল ব্রিটিশ প্রভাব। আসলে স্বাধীনতা মানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি তো নয়, রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাপনের প্রসঙ্গও। কার্যত স্বাধীনতা লাভ হয়েছে শুধুমাত্র চুক্তিপত্রে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ভারতে। দেশ ও সমাজে ঔপনিবেশিক অভিঘাতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, গণ আন্দোলন প্রভৃতিতে সমাজ জীবন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রামীণ কাঠামোতে পরিবর্তন হয়নি কোনো। পরিবর্তন করার জন্য 'বর্গাদার আইন'(১৯৫০), জমি অধিগ্রহণ আইন(১৯৫৩), ভূমি সংস্কার আইন(১৯৫৫) ইত্যাদি আইন পাশ হলেও সাধারণ কৃষক, ভাগচাষী ও খেতমজুরের প্রকৃত উন্নতি হয়নি। ক্ষমতা অব্যাহত থেকে গেছে জোতদার ও মহাজনদের। ঘটনাগুলিকে আমরা যদি পরপর সাজাই, আমরা দেখতে পাবো ১৯৪২ সালের ভয়াবহ বন্যা, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬১-৬২ সালের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৬২ সালে ভারত চিন যুদ্ধ, ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'রাঙাদির রূপকথা' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটির মধ্যে আমরা বাঙালির শৈশবকে কিরকমভাবে পেতে পারি? আদৌ কি শৈশবের কিছু অবশিষ্ট আছে এই বইটির মধ্যে? এত এত মারাত্মক ঘটনা ঘটে যাবার পর শিশুর শৈশব নিয়ে কি ভাবিত হওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দেবো গল্পগুলিকে নিয়ে আলোচনা করার পর।

বইটির ভূমিকা অংশটি দেখলে দেখা যাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইয়ের ভূমিকায় বলা কথাগুলিকে আরও একবার নতুন করে বলছেন। রূপকথা শিশুমনের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে তা বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে। সঙ্গে তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের কাছেও ঋণ স্বীকার করছেন। তিনি বলছেন –

"পরম শ্রদ্ধাভাজন গুরুস্থানীয় চিরশিশু চিরকিশোর জ্ঞানবৃদ্ধ স্বর্গত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের চরণোদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে 'রাঙাদির রূপকথা' বাংলার ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দিলুম। তারা খুশি হলেই শ্রম সার্থক হবে"[১২]।

শিশুমনে রূপকথার প্রভাব সম্বন্ধে তিনি বলছেন –

"এগুলি সকলের অজান্তে ছেলেদের মনে – শক্তি বুদ্ধি সাহস, দয়ামায়া স্নেহ সহিষ্ণুতা, ভালোমন্দ বিচারবুদ্ধি, ন্যায়ে নিষ্ঠা, অন্যায়ে ঘৃণা, সত্যের পুরস্কার, অসত্যের তিরস্কার, ন্যায়ের শান্তি, অন্যায়ের শাস্তি – নীতিগুলির কোনোটি না কোনোটি প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে"[১৩]।

এই সংকলনটিতে আছে পাঁচটি গল্প। প্রথম গল্পটি 'সাত মায়ের এক ছেলে'। 'বাংলার উপকথা' সংকলনটিতে এই একই নামে একটি গল্প আছে। 'বাংলার উপকথা' সংকলনের এই গল্পটির সঙ্গে আমরা 'রাঙাদির রূপকথা' সংকলনের এই গল্পটির কাহিনীতে সাদৃশ্য পাবো। গল্পটিতে এক রাজা এবং সাত রাণী পাবো। রাজার কোনো সন্তান নেই। শিকার করতে গিয়ে আরো একটি মেয়েকে বিয়ে করে রাণী করে আনেন। এই রাণী যে রাক্ষসী তা রাজা জানেন না। এই নতুন রাণীর কথা মতো রাজা বাকি সাত রাণীকে রাজ্য থেকে বের করে দেন। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাবো এই সাত রাণীর প্রত্যেকের একটি করে সন্তান হবে এবং এই রাক্ষসী রাণী রাক্ষসী পাখি হয়ে তাদের প্রত্যেকের সন্তানকে খেয়ে ফেলবে। বেঁচে থাকবে শুধু ছোটো রাণীর ছেলেটি। এই ছেলেটিই রাজ্য এবং রাজাকে রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করবে। আমরা দেখতে পাবো এই রাজপুত্র চাকর সেজে রাজ্যে আসবে, রাক্ষসী রাণীর আসুখ সারিয়ে তোলার জন্য রাজার কথামতো রক্তসমুদ্দুরের তীরে যাবে, সেখানে রাক্ষসী রাণীর

পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের প্রাণ যে শুকপাখির মধ্যে আছে সেটি নিয়ে রাজসভায় উপস্থিত হবে। "শুকপাখিটি হাতে নিয়ে রাজভৃত্য বলে – মহারাজ, জিয়নকাঠি মরণ কাঠি রাক্ষুসে পাখির পরান এটি। হয় কি নয় পরখ করুন, সভাসুদ্ধ সবাই দেখুন – এর যে অঙ্গ ছিঁড়ে যাবে রাক্ষুসে পাখির সেই অঙ্গ ছিঁড়ে পড়বে সভামাঝে। রাজভৃত্য পাখির ডান পা-টা ছিঁড়ে দেয়। অমনি নতুন রানির ডান পা খসে পড়ে সিংহাসনের নীচে"। (রাঙাদির রূপকথা, সাত মায়ের এক ছেলে, পৃ: ১৯) এইভাবে আমরা দেখতে পাবো রাক্ষসী রাণীকে এবং তার বংশকে শেষ করে রাজা এবং তার রাজ্যকে উদ্ধার করছে চাকররূপী রাজপুত্র। রক্তসমুদ্দুরের তীরে যাওয়া রাক্ষসদের মারার উপায় জেনে আসা, রাজা এবং রাজ্যকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে রাজপুত্রের বীরত্ব প্রকাশিত। এই বীরত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি লালবিহারী দে'র কাছে ঋণী, একথা আমরা বলতে পারি।

দ্বিতীয় যে গল্পটি সেটিও 'বাংলার উপকথা' সংকলনের একটি গল্পের অনুকরণ। দ্বিতীয় গল্পটি অর্থাৎ 'রাজপুত্তুর সবুর' গল্পটি 'বাংলার উপকথা' সংকলনের 'লক্ষ্মীমণির স্বামী' গল্পের অনুকরণ। এই গল্পে আমরা বাঙালির বাণিজ্যযাত্রার খোঁজ যেমন পাবো তেমনভাবে একটি মেয়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনীও পাবো। প্রথমেই আমরা সদাগরকে পাবো, যে কিনা বাণিজ্যে যাবার আগে তার সব মেয়েকে ডেকে জানতে চেয়েছে তারা আসলে কার জন্য বেঁচে আছে। একমাত্র ছোটো মেয়ে পুষ্প বলেছে সে নিজের জন্য বেঁচে আছে। তারপর আমরা দেখবো সদাগর তার ছোটো মেয়েকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, পুষ্প নিজের চেষ্টায় কিভাবে বাবাকে বলা কথাটি প্রমাণ করল তার বর্ণনা পুরো গল্প জুড়ে আছে। পরবর্তীতে রাজপুত্তুর সবুরের আগমন, পুষ্পর সাথে বিবাহ, রাজপুত্রের অসুখ, তাকে সারিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে পুষ্পর লড়াই বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় যে গল্পটি আছে সেটিও 'বাংলার উপকথা' সংকলনের একটি গল্পের অনুকরণ। 'বাংলার উপকথা' সংকলনের 'ব্রহ্মদত্যির কথা' গল্পের সাথে তৃতীয় গল্পটি অর্থাৎ 'বেহ্মদত্যি'র হুবুহু মিল আছে। চতুর্থ যে গল্পটি এই সংকলনে আছে সে গল্পটির নাম 'চম্পাদল ও সহস্রদল'। 'বাংলার উপকথা' সংকলনের 'রাক্ষসের গল্প' গল্পটির সাথে এই গল্পটির সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই। গল্পের শুরু ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী কে নিয়ে। ব্রাহ্মণীর কথামতো ব্রাহ্মণের দান নিতে রাজার মায়ের শ্রাদ্ধে যাওয়া এবং পথ হারিয়ে ফেলা এবং রাক্ষসরূপী কন্যার সাথে দেখা হওয়া পরপর বর্ণিত। এরপর ব্রাহ্মণী এবং রূপসী রাক্ষসী কন্যার চম্পাদল ও সহস্রদল নামে সন্তান হওয়া এবং সহস্রদল কর্তৃক রাক্ষসীর হত্যা গল্পে আছে। গল্পে আমরা দেখতে পাই "সহস্রদল বলে – চম্পা ভাই, ভয় নাই, নিজের হাতে কেটে ফেলেছি, রাক্ষসী আর নাই"। (রাঙাদির রূপকথা, চম্পাদল ও সহস্রদল, পৃ: ৫৩) এরপর আমরা দেখবো চম্পাদল ও সহস্রদল এক গাঁয়ে এসে পড়ে। সেখানে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচানোর মাধ্যমে দুই ভাইয়ের বীরত্ব প্রকাশিত। গল্পে দেখতে পাবো "মুখের কথা মুখে, হুড়হাড় দুড়দাড় – মন্দিরের দরজা চুরমার – রাক্ষসী ইয়া ইয়া হাত বাড়িয়ে চম্পাদলকে ধরে ধরে – সহস্রদল ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে তলোয়ারের মুঠি চেপে ধরে এক কোপে রাক্ষসীর মাথা কেটে ফেলে। পাহাড়-পর্বত নড়ে, মাটি থরথর করে রাক্ষসীর বিশাল দেহ যোজন জুড়ে মাটিতে পড়ে। রাক্ষসীর কাটা মাথা চাদরে বেঁধে মন্দিরের ভেতরে দুটি ভাই পাশাপাশি শুয়ে থাকে"। (রাঙাদির রূপকথা, চম্পাদল ও সহস্রদল, পৃ: ৫৭) পরবর্তীতে রাজকন্যা কেশবতীকে উদ্ধার করার জন্য চম্পাদলের অভিযান, রাক্ষস বংশকে ধ্বংস করা ইত্যাদি বীরত্বপূর্ণ কাজের কথা পরপর উল্লেখ করা আছে।

পরবর্তী যে গল্পটির কথা আমরা বলতে চাইছি সেই গল্পও আসলে 'বাংলার উপকথা' সংকলনের একটি গল্পের অনুকরণ। 'বাংলার উপকথা' সংকলনের 'চাঁদের কপালে চাঁদ' গল্পের সাথে এই সংকলনের 'চন্দ্রধর' গল্পের সাদৃশ্য দেখতে পাই আমরা। রাজা এবং ছয় রাণীর কথা

দিয়ে গল্পের শুরু হলেও তার ঠিক পরেই জানানো হচ্ছে রাজা নিঃসন্তান। রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজা ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে বিবাহ করেন। সন্তান জন্ম নেয় কিন্তু বাকি ছয় রাণী তার সেই সন্তান দুটিকে মারার জন্য ধাইকে দিয়ে কুমোরবাড়িতে রেখে আসে। কুমোর এবং কুমোরের স্ত্রীয়ের কাছে দুটি ছেলেমেয়ে বড় হয়। একটা সময় পর কুমোর এবং কুমোরের স্ত্রী মারা যায় এবং দুই ভাইবোন রাজার বাজারে চলে আসে এবং সেখানে তারা ঘর বেঁধে থাকতে শুরু করে। পরবর্তীতে বোনের জন্য চন্দ্রধরের কেতকী ফুল আনতে বলা, রাক্ষসীদের রাজ্যে যাওয়া, রাজকন্যা পুষ্পবতীর সাথে দেখা হওয়া, পুষ্পবতীকে ব্যবহার করে রাক্ষসীর কাছ থেকে তাদের তাদের মৃত্যুর উপায় জানা এবং রাক্ষসদের মারার মধ্যে দিয়ে রাজপুত্র চন্দ্রধরের বীরত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনজন লেখকের যে গল্পগুলি সেগুলির মধ্যে আমরা কিছু কিছু পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি। প্রেক্ষাপটের সাথে সাযুজ্য রেখে আমরা দেখতে পেয়েছি লালবিহারী দে'র 'বাংলার উপকথা' গল্পগুলির মধ্যে যে রাজপুত্রদের কথা বলা হচ্ছে তারা আসলে কৌশলে, ছদ্মবেশে রাক্ষসকে মারছে, রাজকন্যাকে উদ্ধার করছে। এখানে বাঙালি শিশুকে ছদ্মবেশি রাজপুত্রের কথা শোনানো হচ্ছে। আমরা আগেই বলেছি এই বইটি যখন প্রকাশিত হচ্ছে সে সময় জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাঙালির বীরত্বের প্রকাশ হয়েছে তাই কৌশলকে অবলম্বন করেই। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পগুলির মধ্যে আমরা দেখেছি রাজপুত্ররা কোনোরকম কৌশল বা ছদ্মবেশ নিয়ে উপস্থিত নয়। সরাসরি নিজের আসল পরিচয়, বীরত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আমরা জেনেছি 'ঠাকুরমার ঝুলি' যে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে লেখা হয়েছে সে সময় জাতীয়তাবাদ প্রবল। বাঙালি তার বাঙালিত্ব নিয়ে প্রবলভাবে উপস্থিত। তাই গল্পগুলির মধ্যে বাঙালিকে হাজির করা হয়েছে সেরকমভাবেই। বাঙালির শিশুর শৈশবের মধ্যেও এই প্রবল বাঙালিত্বকে

তৈরি করার জন্য গল্পগুলিকে বলা হচ্ছে প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্ক রেখেই। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'বাংলার উপকথা' সংকলনের মধ্যে বাঙালির শৈশবকে যেমনভাবে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে, 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে সেই শৈশবকে তেমনভাবে ধরার চেষ্টা হচ্ছে না। শৈশবকে নির্মাণ করার ধরণটা পাল্টে যাচ্ছে। আসলে বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি প্রেক্ষাপট অনুসারে পাল্টে যাচ্ছে। অন্যদিকে 'রাঙাদির রূপকথা'তে আমরা নতুন কিছু পাচ্ছি না। 'বাংলার উপকথা'র গল্পগুলিতে বলা কাহিনীকে নতুনভাবে বলা হয়েছে এই যা। আমরা আগেই বলেছি এই বইটি প্রকাশের প্রেক্ষাপট। যে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বইটি লেখা সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শৈশব নিয়ে নতুন কিছু বলা বা শৈশবকে তৈরি করা হয়তো সম্ভব ছিল না। তাই প্রথমেই লেখক, দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কাছে ঋণ স্বীকার করছেন। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি ১৯০৭ সালের পর রূপকথার কোনো পুনরাবৃত্তি হয়নি, শুধু অনুবৃত্তি হয়েছে। রূপকথা তৈরি হতে পারতো কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী খাদ্য আন্দোলন, খাদ্য সংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি কারণে শৈশব নিয়ে আর নতুন কিছু বলার নেই। শৈশবের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে এসবের কারণেই। আমরা দেখেছি 'বাংলার উপকথা' বা 'ঠাকুরমার ঝুলি' বই দুটির রচনার প্রেক্ষাপট আলাদা কিন্তু 'রাঙাদির রূপকথা' বইটির প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও শৈশবের নতুন কোনো স্বপ্ন নেই। এই লেখক শুধু চায় পুরনো স্বপ্নগুলিকে জাগিয়ে তুলতে। আসলে নতুন কোনো স্বপ্ন নেই। যে স্বপ্ন আছে সে স্বপ্নে রূপকথা লেখা সম্ভব নয়। যে স্বপ্ন আছে তাতে শিশুর শৈশবকে তৈরি করা যাবে না। তাই লেখক ফিরে যাচ্ছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয়ের কাছে, লালবিহারী দে'র কাছে। আসলে 'বাংলার উপকথা' বা 'ঠাকুরমা'র ঝুলি'তে স্বপ্ন আছে। 'রাঙাদির রূপকথা'তে সেই স্বপ্নের নতুন করে খুঁজতে চাওয়া আছে।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে 'Intertextuality' নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমরা বলতে চেয়েছিলাম 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রসদ 'বাংলার উপকথা' বইটির মধ্যে আছে। একইরকমভাবে বলেছিলাম

‘রাঙাদির রূপকথা’ বইটির রসদও ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ এবং ‘বাংলার উপকথা’ বইটির মধ্যে আছে। আমরা গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখেছি ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’র বেশ কিছু গল্পের কাহিনী ‘বাংলার উপকথা’ সংকলনের গল্পগুলি থেকে নেওয়া। একইরকমভাবে দেখেছি ‘রাঙাদির রূপকথা’ গল্পের সব কাহিনী ‘বাংলার উপকথা’ সংকলন থেকে ধার করা। তাহলে এটা আমরা বলতেই পারি এই তিনটি বইয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক আছে। ‘বাংলার উপকথা’ বইটির প্রভাব ‘ঠাকুরমা’র ঝুলি’ এবং ‘রাঙাদির রূপকথা’তে আছে।

শেষে এই কথা বলাই যায় বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণে রূপকথা-উপকথার এই গল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আসলে এই বইগুলির মাধ্যমে বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটিকে ধরা আছে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাঙালির শৈশবে যে নতুন আইডেন্টিটি যুক্ত হচ্ছে তা এই বইগুলির মধ্যে ধরা আছে। বাঙালির বীরত্বকে নতুন নতুন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি।

উল্লেখপঞ্জি

১। https://en.oxforddictionaries.com/definition/identity

date. 20/04/2019, time- 10:20 p.m.

২। https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/identity

date. 20/04/2019, time- 10:25 p.m.

৩। https://www.yourdictionary.com/identity

date. 20/04/2019, time- 10:30 p.m.

৪। http://www2.iath.virginia.edu/elab/hfl0278.html

date. 21/04/2019, time- 11:10 a.m.

৫। http://www2.iath.virginia.edu/elab/hfl0278.html

date. 21/04/2019, time- 11:18 a.m.

৬। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intertextuality

date. 21/04/2019, time- 11:30 a.m.

৭। রেভারেন্ড লালবিহারী দে, 'গ্রন্থকারের ভূমিকা', *বাংলার উপকথা*, লীলা মজুমদার (অনুদিত), কলকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, পৌষ ১৪২৩, পৃ. ৫

৮। লীলা মজুমদার, 'অনুবাদকের নিবেদন', *বাংলার উপকথা*, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, কলকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, পৌষ ১৪২৩, পৃ. ৮-৯

৯। তদেব, পৃ. ৯

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯

১১। তদেব, পৃ. ১১

১২। ত্রিভঙ্গ রায়, *রাঙাদির রূপকথা*, কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ৫

১৩। তদেব, পৃ. ৪

শেষকথা

আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল উনিশ-বিশ শতকের শৈশব নির্মাণে রূপকথা-উপকথার ভূমিকা। অর্থাৎ আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি উনিশ-বিশ শতকের নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ায় রূপকথা-উপকথার ভূমিকা। উনিশ-বিশ শতকের যে শৈশবের ধারণা তা যে প্রাক-ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ছিল না তা আমরা বলার চেষ্টা করেছি পূর্ববর্তী আলোচনায়। যে শৈশব ধারণার কথা বলছি তা যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হওয়া একটা ধারণা তাও আমরা বলার চেষ্টা করেছি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যদি শৈশবের কথা বলি তাহলে বলা যায় উনিশ-বিশ শতকে যে শৈশবের ধারণা বা বলা যায় শৈশব নির্মাণের যে ধারণা ছিল তার সাথে বর্তমানের শৈশবের ধারণার পার্থক্য থাকলেও বেসটা কিন্তু একই আছে। বর্তমানের শৈশব নির্মাণের পদ্ধতির সঙ্গে অনেক এক্সট্রা বিষয় বা ধারণা এসে যুক্ত হয়েছে। শৈশব নির্মাণের পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য ধরা পড়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গ্রাম বা গ্রামকেন্দ্রিক অঞ্চলে শৈশব নির্মাণের পদ্ধতি যেমনটা শহর বা শহরকেন্দ্রিক অঞ্চলে শৈশব নির্মাণের পদ্ধতি তেমনটা নয়। উনিশ-বিশ শতকের যে শৈশব সেই শৈশবকে বিধিবদ্ধভাবে নির্মাণ করার জন্য প্রাইমার যে ভূমিকা পালন করে সেই ভূমিকাকে বজায় রাখার কারণে রূপকথা-উপকথাকে ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানের যে শৈশব সেই শৈশবে রূপকথা-উপকথার কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। বর্তমানের শিশু রূপকথা-উপকথার গল্প জানে না। বাবা-মায়ের মুখ থেকে শোনার সম্ভাবনাও কিন্তু খুব কম। কারণ বর্তমানে বাবা-মা শিশুকে রূপকথা-উপকথার গল্প শোনায় না। আসলে বর্তমানের যে শৈশব তার সাথে বেশি করে যুক্ত হয়েছে প্রতিযোগিতায় সর্বদা প্রথম হবার স্বপ্ন, অন্য সবাইকে হারিয়ে প্রথম হবার বাসনা। শিশুর শৈশবকে নির্মাণ করার প্রথম চেষ্টা কিভাবে সবার থেকে আলাদা হতে হবে। আসলে

বর্তমানের শৈশব বড্ড বেশি স্বার্থপরতার বোধ দ্বারা নির্মিত। এখানে প্রশ্ন হতেই পারে যে উনিশ-বিশ শতকের যে শৈশব সেই শৈশবের সাথে কি স্বার্থপরতার যোগ ছিল না? ভালো হতে হবে, ভোগবাদের আদর্শ হতে হবে এরকম চিন্তাভাবনা উনিশ-বিশ শতক থেকেই তো শুরু আসলে! এই সমস্ত কথা কে মেনে নিলেও উনিশ-বিশ শতকের শৈশবের সাথে বর্তমানের শৈশবের পার্থক্য আছে। বিষয়গত দিক দিয়ে পার্থক্য যেমন আছে, পার্থক্য আছে আঙ্গিকগত দিক দিয়েও। যদিও বর্তমানের শৈশব নির্মাণ আমাদের গবেষণার বিষয় নয়। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় 'উনিশ-বিশ শতকের শৈশবের নির্মাণে রূপকথা-উপকথার ভূমিকা' আমাদের আমাদের গবেষণার দেখেছি ঔপনিবেশিক শিক্ষা যখন আমাদের দেশে তার প্রভাব বিস্তার করছে সেই সময়ে শৈশব ধারণার জন্ম হচ্ছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা আসলে যাদের জন্য, যে বাঙালির জন্য তারা আসলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ভোগবাদী ভাবাদর্শযুক্ত যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা তার সাথে সম্পৃক্ত করে নির্মাণ করতে চেয়েছে। আমাদের এই গবেষণার প্রথম যে অধ্যায় তার নাম আমরা দিয়েছি 'ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার ও বাঙালির শৈশব'। এই অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে নির্দিষ্ট অংশের বাঙালি তারা এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে যেমন সম্পৃক্ত করেছে ঠিক তেমনভাবে তার ভাবীকালকে এই শিক্ষার আদর্শ করে গড়তে চেয়েছে। ভালো এবং খারাপের একটা বাইনারি অবস্থান তৈরি করে প্রতিমুহূর্তে ভালো হবার দৌড়ে বাঙালি তার শৈশবকে সামিল করেছে। যে ভালোর কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু ভোগবাদের আদর্শ। উপযোগবাদের আদর্শ। ভোগবাদ, উপযোগবাদের আদর্শই আসলে বাঙালির শৈশব। কার্যত সবকিছু ভুলে উপযোগবাদের আদর্শ ধরণে বাঙালি তার শৈশবকে নির্মাণ করতে চেয়েছে। তৈরি হয়েছে বাঙালির শৈশব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি বাঙালির এই শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে রূপকথা-উপকথার ভূমিকাকে। আমরা আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম দিয়েছি 'শৈশব নির্মাণ প্রকল্পনায়

রূপকথা-উপকথার ভূমিকা'। এখানে আমরা দেখেছি ঔপনিবেশিক শিক্ষার সময়পর্বে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাঙালি তার অতিত ইতিহাসকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। জাতীয়তাবাদের প্রমাণ স্বরূপ রূপকথা-উপকথাকে সংকলন করা হচ্ছে এবং শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শিক্ষার যে ভাবাদর্শ সেই ভাবাদর্শের সাথে জাতীয়তাবাদের প্রভাবযুক্ত এই রূপকথা-উপকথাকে শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে জায়গা দেওয়া হচ্ছে। যে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে শৈশবকে নির্মাণের চেষ্টা সেই চেষ্টাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই রূপকথা-উপকথাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শিশুমনের কল্পনাকে রুদ্ধ করে না দিয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শকে আরো সুনিপুনভাবে চারিত করতে বাঙালি রূপকথা-উপকথাকে ব্যবহার করছে। তৈরি হচ্ছে বাঙালির শৈশব।

আমাদের এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা দেখাতে চেয়েছি উনিশ-বিশ শতকের শৈশব নির্মাণে রূপকথা-উপকথার ভূমিকাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে রূপকথা-উপকথার প্রভাব। তৃতীয় অধ্যায়ের আমরা নাম দিয়েছি রূপকথা-উপকথার সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিচার। তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের যে আলোচনা তার থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে রূপকথা-উপকথার সংকলনগুলিতে চরিত্রদের মুখের ভাষাও শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমরা দেখতে পাবো, শৈশব নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঙালি তার শৈশবকে অখণ্ড বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজভাষার সাথে পরিচয় করাচ্ছে। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করছে। জাতীয়তাবাদে বাঙালি তার শৈশবকে জারিত করছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার কাঠামোকে বজায় রেখে তৈরি হচ্ছে রূপকথা-উপকথার প্রভাবযুক্ত বাঙালির শৈশব।

ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির শৈশবের যে আইডেন্টিটি সেই আইডেন্টিটিকে নির্মাণ করার ক্ষেত্রেও রূপকথা-উপকথার ভূমিকা আছে। বাঙালি এই রূপকথা-উপকথার

সংকলনগুলিকে যতই ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিরুদ্ধতাবাদী অবস্থান হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুক না কেন, বাঙালি তার শৈশবকে নির্মাণ করতে চেয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শকে মাথায় রেখে। আমাদের গবেষণার চতুর্থ যে অধ্যায় সেই অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি বাঙালির শৈশবের আইডেন্টিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে রূপকথা-উপকথার ভূমিকাকে। রূপকথা-উপকথার মাধ্যমে বাঙালি তার শৈশবকে বীরত্বপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার কাঠামোকে বজায় রেখেও। বাঙালি তার শৈশবকে জাতীয়তাবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করলেও উপনিবেশের শিক্ষার উপযোগবাদকে অস্বীকার করতে চায়নি। পুরো আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায় বাঙালি তার শৈশবকে পূর্ববর্তী কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রেখে রূপকথা-উপকথাকে বাঙালি তার বাঙালি ভাব জাগানোর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের ধারণাকে সম্পৃক্ত করেই বাঙালি তার শৈশবকে নির্মাণ করেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ঔপনিবেশিক শিক্ষার ভাবাদর্শকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে রূপকথা-উপকথার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। উনিশ-বিশ শতকে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির যে নির্মিত শৈশব সেই শৈশবকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রূপকথা-উপকথার গল্পগুলি, গল্পগুলির চরিত্র, চরিত্রের ভাষা ব্যবহার, চরিত্রের বীরত্বপূর্ণ মনোভাব উল্লেখযোগ্য জায়গা দাবি করে। উপনিবেশের শিক্ষায় ‘গোপাল’ ‘রাখাল’এর যে বাইনারি অবস্থান এবং ‘গোপাল’ হয়ে ওঠার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাকে জাগরূক রাখার ক্ষেত্রে রূপকথা-উপকথা ভূমিকা পালন করছে। তৈরি হচ্ছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙালির শৈশব।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১। ত্রিভঙ্গ রায়, *রাঙাদির রূপকথা,* কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ২০০৮;

২। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, *ঠাকুরমা'র ঝুলি,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ;

৩। রেভারেন্ড লালবিহারী দে, *বাংলার উপকথা: ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল,* লীলা মজুমদার (অনুদিত), কলকাতা, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, পৌষ ১৪২৩;

সহায়ক গ্রন্থ (বাংলা)

১। অলোক রায়, *উনিশ শতক,* কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১২;

২। অলোক রায়, *বিশ শতক,* কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, বইমেলা জানুয়ারি ২০১৬;

৩। আশিস খাস্তগীর(সম্পাদিত), *বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৬;

৪। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৯;

৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী, নীলিমা চক্রবর্তী, *ভাষাবিজ্ঞান,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৬;

৬। পবিত্র সরকার, *ভাষা দেশ কাল,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অগ্রাহায়ণ ১৪২২;

৭। পরমেশ আচার্য, *বাঙালির শিক্ষাচিন্তা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১১;

৮। পরমেশ আচার্য, *বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা,* কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, বইমেলা ২০০৯;

৯। মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, কলকাতা, নয়া উদ্দ্যোগ, জানুয়ারি ১৯৯৯;

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *লোকসাহিত্য*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৪১৯;

১১। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *আবার শিশুশিক্ষা*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১০;

১২। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস*, কলকাতা, কারিগর, সেপ্টেম্বর ২০১৩;

১৩। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা*, কলকাতা, গাঙচিল, ১ আষাঢ় ১৪১৪;

সহায়ক গ্রন্থ: (ইংরাজি)

১। Ghosh, S.C., *The History of Education in Modern India*, 1757-1986, Orient Longman, Hyderabad, 1955.

২। Adam,W., *Report of the State of Education in Bengal,* Basu, Anathnath (Ed.), University of Calcutta, 1941.

৩। Trudgill, Peter., *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*, England, Penguin Books

ওয়েবসাইটপঞ্জি

১। https://www.goodreads.com/author/quotes/297261.Leonard_Bloomfield

date. 12/03/2019, time- 12:30 a.m.

২। https://www.goodreads.com/author/quotes/78968.Peter_Trudgill

date. 12/03/2019, time- 12.32 a.m.

৩। https://en.oxforddictionaries.com/definition/identity

date. 20/04/2019, time- 10:20 p.m.

৪। https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/identity

date. 20/04/2019, time- 10:25 p.m.

৫। https://www.yourdictionary.com/identity

date. 20/04/2019, time- 10:30 p.m.

৬। http://www2.iath.virginia.edu/elab/hfl0278.html

date. 21/04/2019, time- 11:10 a.m.

৭। http://www2.iath.virginia.edu/elab/hfl0278.html

date. 21/04/2019, time- 11:18 a.m.

৮। https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intertextuality

date. 21/04/2019, time- 11:30 a.m.